পু তু ল
ও
প্র তি মা

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা

নূতন সংস্করণ :
৭ই ফাল্গুন, ১৩৬৩

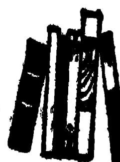
নূতন ২য় মুদ্রণ, ১১০০ সংখ্যা
শ্রাবণ, ১৩৬৬

৩·২৫
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯



উৎসর্গ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

বন্ধুবরেষু



কোন রকমে পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা যায়; কিন্তু ঘাড়টা পর্যন্ত সোজা করিবার উপায় নাই, তুলিলেই নৌকার ছইয়ে ঠেকিয়া যায়।

দাক্ষায়ণী মোটা মানুষ, পায়ে একটু বাতও আছে। পা না ছড়াইয়া বেশীক্ষণ একভাবে তিনি বসিয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু সে অসুবিধার কথা তাঁহার এখন মনেই নাই। সংকীর্ণ নৌকার ছই-ঢাকা স্থানটিতে বসিয়া, তিনি 'সেথো' লক্ষ্মণকে উদ্দেশ করিয়া যে সব গাল পাড়েন তাহার কারণ অন্য।

'সেথো'র কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদেশে, অপরিচিত তীর্থস্থানে যাহার ভরসা করিয়া রওনা হইতে হইয়াছে, মনে মনে যত রাগই থাকুক, তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে কেহ সাহস করে না। গরু-ভেড়ার মত তাল পাকাইয়া নৌকায় সংকীর্ণ ছইএর নীচে অশেষ দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইলেও তাহারা নীরব হইয়াই থাকে।

কিন্তু দাক্ষায়ণী চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী নহেন। পাড়ার ডাকসাইটে তেজী মেয়ে-মানুষ;—বালিকা বয়সে বিধবা হইবার পর লোকে তাঁহার অননুকরণীয় নিষ্ঠা ও ধর্মাচরণের জন্য শ্রদ্ধা যতখানি করে, তাঁহার প্রচণ্ড মুখের ধারকে ভয় করে তাহার চেয়ে অনেক বেশি।

বিদেশে বিভুঁয়ে অপরিচিত তীর্থপথের একমাত্র সহায় হইয়াও লক্ষ্মণ সে মুখের কাছে রেহাই পায় না। দাক্ষায়ণী কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহিবার মেয়ে নয়; বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে তাঁহার রাগের যথেষ্ট কারণ বর্তমান।

"হতচ্ছাড়া মুখপোড়া বাঁদর। দেশে তোকে ফিরতে হবে না? তখন পাইখানার খ্যাংরায় তোর মুখ ভেঙ্গে না দিই ত আমি মুখুজ্যেদের বৌ নই!"

লক্ষ্মণ উত্তর দেয় না; উত্তর দিবে কি, তাহাকে এই কদিন দেখিতেই পাওয়া যায় নাই। হালের মাচানের উপর সভয়ে দাক্ষায়ণীর নাগালের বাহিরে সে দিন কাটায়। দাক্ষায়ণীর সামনে আসিবার সাহস তাহার নাই।

ছইএর ভিতর হইতে দাক্ষায়ণীর কণ্ঠ শোনা যায়—"জোচ্চোর, পাজী, হারামজাদা, আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই ত তোকে সাগর পর্যন্ত পৌঁছুতে হবে না—তার আগে তুই ওলাওঠায় মরবি।"

লক্ষ্মণ এ অভিশাপে শিহরিয়া ওঠে, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার তাহার কিছুই নাই। নৌকার অপর ধারে খোলা পাটার উপর বসিয়া যাহারা কলরব করিতেছে, তাহাদের সম্পর্কেই দাক্ষায়ণীর এই রাগ। লক্ষ্মণেরও এখন মনে হয় পয়সার লোভে এমন কাজটা না করিলেই হইত। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

ছইএর ভিতর হইতে আবার কলরব শোনা যায়। বছর আষ্টেকের একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে ছইএর অপর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে লইয়াই গোল।

দেখিতে সুশ্রী হইলে কি হইবে, ওইটুকু একরত্তি মেয়ের চাল-চলন কথায় বার্তায় অসহ্য পাকামি দেখিলে গা জ্বলিয়া যায়। ছইএর ভিতরকার মেয়েরা একবাক্যে প্রতিবাদ করিয়া বলে—"মানুষের বসবার জায়গা নেই, এখান দিয়ে যাবি কি লা?"

ছোট মেয়েটি তাহার ফুলের মত কচি মুখটি অপরূপ ভঙ্গীতে বিকৃত করিয়া হাত নাড়িয়া বলে,—"যাব না কেন লা! তোমাদের ত কেনা জায়গা নয়!"

অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া মেয়েরা বলে, "ওমা, কোথায় যাব মা! এক ফোঁটা মেয়ের কথার চঙ দেখেছ!"

একজন বলে, "হবে না, কি রক্তে জন্ম!"

মেয়েটা ছোট মুখখানি বাঁকাইয়া বলে, "মুখ নাড়তে আর হবে না, ভালোয়-ভালোয় পথ দাও বলছি, নইলে গায়ের ওপর দিয়ে যাব।"

দাক্ষায়ণী এতক্ষণ কথা বলেন নাই। এবার অগ্নিমূর্তি হইয়া চোখ রাঙাইয়া বলেন—"তবে রে ইল্লুতে মেয়ে—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! যা না দেখি গায়ের ওপর দিয়ে! গলা টিপে পুঁতে ফেলব না!"

কিন্তু দাক্ষায়ণীর চোখ রাঙানিতে ভয় পাইবার মেয়ে সে নয়; চোখ ঘুরাইয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া বলে, "ইস্ পুঁতে অমনি সবাই ফেলে!"

ওদিক হইতে একটি স্ত্রীলোক ডাকিয়া বলে, 'ওদের সাথে আবার লাগতে গেলি কেন লা বাতাসী!"

বাতাসী চক্ষের নিমিষে একেবারে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়া বলে, "দেখ না মা, লক্ষ্মণ দাদার কাছে যেতে চাইলুম তা মাগী গলা টিপে দিলে।"

ছইএর তলায় স্ত্রীলোকের দল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যায়—"ওমা কি ঘেন্না! তোর গলা টিপলে কে লা ছুঁড়ি? আবার বলে কি না মাগী!"

বাতাসী ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে অসংকোচে বলে—"না বলবে না! গলা টিপে দিলে চুপ করে থাকবে!"

"হ্যাঁ গা, ওই কচি মেয়ের গলা টেপা কিসের জন্যে?" বলিয়া যে স্ত্রীলোকটি উঠিয়া আসে—শীর্ণ অসুস্থ কুৎসিত মুখে, কোটরপ্রবিষ্ট দুই

চোখে, দেহের সমস্ত ভঙ্গীতে, তাহার জীবনের কদর্য ইতিহাস অতি স্পষ্ট ভাবেই লেখা—দেখিলে চিনিতে বিলম্ব হয় না। কাছে আসিয়া বাতাসীকে কোলের কাছে টানিয়া নিয়া সে বলে—"কে, গলা টিপলে কে শুনি!"

বাতাসী অম্লানবদনে দাক্ষায়ণীর দিকে দেখাইয়া দিয়া বলে, "ওই ধুমসি মাগীটা!"

দাক্ষায়ণীর মুখে পর্যন্ত এই নির্লজ্জ মিথ্যা অভিযোগে খানিকক্ষণ কথা সরে না। তাহার পর নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাইয়া লইয়া তিনি কটুকণ্ঠে বলেন,—"আমি গলা টিপলে আজ যে মরে স্বর্গে যেতিস্ ছুঁড়ি। সে ভাগ্যি তোর হবে!"

ঝগড়াটা ইহার পর আরো কত প্রচণ্ড হইয়া উঠিত বলা যায় না, কিন্তু মাঝিরা ইতিমধ্যে আসিয়া মাঝে পড়িয়া বাতাসী ও তাহার মাকে একরকম জোর করিয়াই সরাইয়া লইয়া যায়। দূর হইতে পরস্পরের প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ ইহার পর চলিতে থাকে, কিন্তু বিশেষ কিছু কেলেঙ্কারী আর হইতে পারে না।

ডায়মণ্ড হারবার হইতে নৌকা ছাড়িবার পর এমনিতর গোলযোগ কয়দিন ধরিয়াই চলিতেছে। নৌকা ছাড়িবার পর তাঁহাদের সঙ্গে বেশ্যার দলকে সহযাত্রী করা হইয়াছে জানিতে পারা অবধি দাক্ষায়ণী নৌকায় আর জলগ্রহণ করেন নাই। এখন আর উপায় নাই, নহিলে তিনি বোধ হয় নৌকাও ত্যাগ করিয়া যাইতেন।

এই কয়দিনের ভিতর মাত্র দুইবার চরে নৌকা লাগান হইলে তিনি ভাল করিয়া স্নান করিয়া সামান্য একটু আহার করিয়াছেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁহার নৌকায় নিরম্বু উপবাসে কাটিয়াছে। অন্যান্য ভদ্র যাত্রীরা সকলেই স্ত্রীলোক এবং তাহাদের অধিকাংশই তাঁহার মত

বিধবা। তাহারা তাঁহার মত অতখানি আত্মসংযম কিন্তু করিতে পারে নাই। গঙ্গাজল ও বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নাই ইত্যাদি বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিয়াছে, তাঁহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু দাক্ষায়ণীর সঙ্কল্প অটল।

উপবাস তাঁহার এক রকম গা সওয়া হইয়া গিয়াছে, বিশেষ কিছু কাবু তিনি তাহাতে হইয়াছেন এমন মনে হয় না। কষ্ট যেটুকু হইয়াছে 'সেথো' লক্ষণকে গাল পাড়িয়া তিনি সেটুকু একরকম লাঘব করিয়া লইয়াছেন। আজ কিন্তু এতদিন বাদে তাঁহাকে যেন ক্লান্ত দেখায়—ছোট ওই এক ফোঁটা মেয়ের হাতে অপমানটা তাঁহার বড় বেশী বাজিয়াছে মনে হয়। আর সকলে উত্তেজিত হইয়া ওই কচি মেয়েটার সয়তানী বুদ্ধি, তাহার কলঙ্কিত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি অনেক কথা লইয়াই আলোচনা করে।

"আঁতুড়ের গন্ধ গা থেকে যায়নি, মেয়েটার কথা শুনলে গা!"

"কচি দাঁতে এত বিষ, বড় হলে ও কত সংসারে আগুন দেবে মা কে জানে!"

"ওই এক রত্তি, আমাদের নাতনীর বয়সী মেয়ে—দিনকে একেবারে রাত করে দিলে গা!"

"কে জানে মা, মা গঙ্গার কি মহিমে! নইলে এত পাপও তিনি স'ন।"

কিন্তু দাক্ষায়ণী এ সমস্ত আলোচনায় যোগ দেন না; এমন কি 'সেথো' লক্ষণকে গাল দিতেও তিনি আজ ভুলিয়া যান।

দুইদিন পরের কথা। শতমুখী পিছনে ফেলিয়া নৌকা ধবলাটের কাছাকাছি আসিয়া নোঙর করিয়াছে। কুয়াসাচ্ছন্ন তিমিরলিপ্ত রাত্রে

তীরতট কিছু দেখা যায় না, শুধু নৌকার গায়ে গঙ্গার স্রোতের মৃদু আঘাতের শব্দ শোনা যায়। আকাশ ও জল অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে; তাহারই মাঝে শুধু দূরে দূরে সাগরমুখী চলমান কয়েকটি নৌকার ক্ষীণ আলো দেখিয়া গাঙ্গের সীমা নির্ণয় করা চলে। সংকীর্ণ জায়গায় আর সকলের মত আড়ষ্ট হইয়া ঘুমাইতে দাক্ষায়ণী পারেন না। একাকী জাগিয়া তিনি ছইএর ছিদ্রপথে গাঙ্গের কালো জলের দিকে চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল জলের শব্দ যেন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যায় নোঙর ফেলিবার সময় মাঝিদের কথাবার্তা তাঁহার কিছু কানে গিয়াছিল—তাহাদের কথাতেই শুনিয়াছিলেন—এখানকার জোয়ার বড় প্রবল, তখন নৌকা না সামলাইলে বিপদের সম্ভাবনা।

সহসা তিনি ভীতা হইয়া উঠিলেন—এই জোয়ার নয় ত? কিন্তু মাঝিরা সবাই ত ঘুমাইতেছে। যদি কোন বিপদ ঘটে!

জলের শব্দ ক্রমশঃ আরো বাড়িয়া উঠিতেছিল।

মাঝিদের ডাকা উচিত কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় ভীষণ শব্দ করিয়া ছোট নৌকাটি উন্মত্তভাবে দুলিয়া উঠিল।

জোয়ারের টানে বেহাল হইয়া প্রকাণ্ড এক মহাজনী ভড় ছোট নৌকাটির উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

পলকের মধ্যে ভীত সদ্যসুপ্তোত্থিত মাঝি ও যাত্রীদের চীৎকারে, নৌকার তক্তাগুলির প্রচণ্ড বিদারণ-শব্দে অন্ধকার নদীবক্ষ মুখর হইয়া উঠিল। কোথা দিয়া সেই নিদারুণ মুহূর্তে কি যে হইয়া গেল—দাক্ষায়নী কিছুক্ষণের জন্য একপ্রকার জ্ঞান হারাইয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

খানিক বাদে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাইলেন নদীর হিমশীতল জলে তিনি কেমন করিয়া ভাসিতেছেন। সামনে অস্পষ্ট-

ভাবে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল দৈত্যের মত বৃহদাকার ভড়ের কালো ছায়ামূর্তির সঙ্গে তাঁহাদের নিষ্পেষিত নৌকাটি যেন জড়াইয়া গিয়াছে।

হাল ভাঙ্গিয়া পাণিতরাস চৌচির হইয়া সে নৌকা ডুবিতেছিল।

ছেলেবেলা সাঁতারের অভ্যাস ছিল, দাক্ষায়ণী দেখিলেন এখনও ভাসিয়া থাকিতে তাঁহার কষ্ট হয় না। ভড়ের মাঝি মাল্লারা এই বিপদে ছুটাছুটি করিয়া হল্লা করিতেছিল, চীৎকার করিয়া একবার তাহাদের ডাকিলেন, কিন্তু শুনিতে কেহ পাইল বলিয়া মনে হয় না।

প্রৌঢ় বয়সে এই হিমশীতল জলে বেশীক্ষণ ভাসিয়া থাকিতে পারিবেন এমন আশা দাক্ষায়ণীর ছিল না। শুধু তাই নয়, সুন্দরবনের গাঙের কুমীরের কথাও তিনি জানিতেন—ভাসিয়া থাকিলেও কতক্ষণ আর রেহাই পাইবেন!

এমন সময় দৈব খানিকটা কৃপা করিল। ভাঙ্গা নৌকার হালটা সামনে দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। অন্ধকারে প্রথমটা তাহার কালো মূর্তি দেখিয়া দাক্ষায়ণী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরমুহূর্তে বুঝিতে পারিলেন সেটা কাঠ। সবলে সেটিকে তিনি আঁকড়াইয়া ধরিলেন।

কিন্তু এটা কি? পুঁটুলির মত একটা কি জিনিস হাতে ঠেকিতেই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

পুঁটুলি হইতে অস্ফুট একটা ভীত শব্দও যেন বাহির হইল।

মুখটা একটু কাছে লইয়া গিয়া ভাল করিয়া নজর করিয়া দেখিতেই সব পরিষ্কার হইয়া গেল। ভীত কাতর ছুটি চক্ষু মেলিয়া বেশ্যাদের সেই ছোট মেয়েটা প্রাণপণে হালের এক দিক আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এই নিদারুণ মুহূর্তেও তাহাকে স্পর্শ করিয়া ঘৃণায় দাক্ষায়ণীর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভড়ের উপরকার মাঝিরা তখন কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া বোধ হয় নিমজ্জমান যাত্রীদেরই অনুসন্ধান করিতেছে।

তাহার অস্পষ্ট আলোয় সেই অসহায় মেয়েটার মুখ দেখিয়াও বিন্দুমাত্র অনুকম্পা তাঁহার হইল না। বিষাক্ত সরীসৃপ-শিশুর মত এই একদিন বড় হইয়া সংসারকে পাপের বিষে জর্জর করিয়া তুলিবে এমন একটা অস্পষ্ট চিন্তায় তাঁহার মন বিজাতীয় ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার অসহায় কান্না, দুর্বল দুটি হাতে প্রাণপণে হালটিকে জড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা, এ সমস্ত কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া সবলে তিনি তাহাকে জলে ঠেলিয়া দিলেন।

মেয়েটা 'মাগো' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, খানিকটা ডুবিয়া জল খাইয়া নাকাল হইয়া ক্ষীণ দুটি বাহু তুলিয়া তাঁহার হাতটা ধরিবার একবার নিষ্ফল চেষ্টা করিল, তাহার পর আবার ডুবিল;—মশালের আলোয় ঈষৎ রক্তাভ নদীর কালো জল তাহার শেষ চীৎকারের মাঝখানে যেন সহসা নিস্তব্ধতার যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মেয়েটার সেই শেষ অর্ধস্ফুট চীৎকারে দাক্ষায়ণীর মনে কি যেন সব ওলট-পালট হইয়া গেল। ডুবিবার আগে তাহার সে ভীত সকাতর মুখের মিনতি ভুলিবার নয়। কলঙ্কিত একটা বেশ্যার মেয়ে—শিরায় শিরায় তাহার পাপের পঙ্কিল রক্ত; বাঁচিয়া সে শুধু সংসারের পাপের ভারই বাড়াইত না, নিজের ও তাহার দুর্গতির সীমা থাকিত না, এ সব ভাবিয়া তাঁহার মন প্রবোধ মানিতে চাহিল না। তখনও যেন অস্পষ্টভাবে তাহার কাপড়ের একাংশ জলের উপর ভাসিতে দেখা যাইতেছিল। এখনও হয়ত তোলা যায়। কিন্তু অবশ দেহমনে এই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাওয়াও যে সহজ নহে। দারুণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দাক্ষায়ণী উন্মত্তের মত হইয়া উঠিলেন।

হঠাৎ অনতিদূরে মেয়েটার মাথাটা ভাসিয়া উঠিল।

দাক্ষায়ণী ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। কিন্তু জলের ভিতর হাতড়াইয়া কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। এই কয়দিনের উপবাসে দুর্বল বাতগ্রস্ত

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এতক্ষণ শীতল জলে থাকার দরুন ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিতেছিলেন। তবু আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া তিনি চারিদিকে খুঁজিয়া দেখিলেন—হাতের মুঠায় কি যেন একটা ধরিয়াছেনও মনে হইল, কিন্তু তখন তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নাগালের অত্যন্ত কাছে কালো হালের কাঠটা তখনও ভাসিতেছিল, দাক্ষায়ণী হাত বাড়াইয়া সেটা ধরিবার চেষ্টা করিলেন—হাত তাঁহার উঠিল না। মুঠায় যাহা ধরিয়াছিলেন, সেটাই শুধু তাঁহার আড়ষ্ট হাতে জড়াইয়া রহিল।

কিন্তু অপঘাতে মৃত্যু দাক্ষায়ণীর কপালে নাই।

জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনিতে পান নিকটে কাহারা বলিতেছে—"তাইতেই বলে না মায়ের প্রাণ!"

দুর্বল দেহে অবসন্ন মনে কথাটার কোন তাৎপর্য তিনি বুঝিতে পারেন না, বুঝিবার উৎসাহও তাঁহার থাকে না। সারা দেহে অসীম ক্লান্তি অনুভব করিয়া দাক্ষায়ণী আবার ঝিমাইয়া পড়েন।

কিন্তু সকালবেলা তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া ওঠেন। সামান্য যেটুকু দুর্বলতা থাকে তাহা এমন কিছু মারাত্মক নয়।

তিনি যেখানে শুইয়া আছেন, সেটা যে কোন নৌকারই একটা ঘর তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় না। ডান পাশের খুদরি জানালা দিয়া দিগন্ত-প্রসারিত জলরাশির উপর প্রভাতসূর্যের আরক্ত জাগরণ প্রথমেই চোখে পড়ে। নৌকার এ ঘর তাঁহার অপরিচিত। জলে ডুবিয়া মরিতে মরিতে কোনরকমে তিনি উদ্ধার পাইয়াছেন, এইটুকুই শুধু বুঝিতে পারেন, কেমন করিয়া এই অপরিচিত নৌকায় স্থান পাইয়াছেন, কে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছে, কিছুই তাঁহার স্মরণ হয় না।

অপরিচিত এক বৃদ্ধ মাঝি আসিয়া একগাল হাসিয়া বলে—"মা গঙ্গার খুব কির্‌পা বোলতে হবে মা-ঠাকরুন, নিতে নিতে ফিরিয়ে দেছেন। আর একটু দেরি হলে দুজনের কাউকে তুলতে পারা যেতনি।"

দেখিতে দেখিতে আরো কয়েকজন মাঝি মাল্লা দরজার কাছে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়।

একজন বলে, "মেয়েটা যা জল খেয়েছেল, বাঁচবে বলে আর আশা ছেলনি। মা-ঠাকরুনের খুব পুণ্যি ছেল তাই!"

বৃদ্ধ মাঝি বলে—"যা জম্পেস করে তেনার কাপড়টা ধরেছেলেন মা-ঠাকরুন, আমি ত পেরথমে ছাড়াতেই নারলুম।"

আর একজন বলে, "তা জম্পেস করে ধরবেনি? মায়ের প্রাণ ত বটে!"

কে একজন ইতিমধ্যে মেয়েটাকে কোলে করিয়া তুলিয়া আনিয়া একেবারে দাক্ষায়ণীর কোলের কাছে বসাইয়া দিয়া বলে, "নেন মা-ঠাকরুন, মেয়েকে আপনার একদম চাঙ্গা করে দিছি।"

দাক্ষায়ণী এতক্ষণ নির্বাক হইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন, এইবার কিন্তু বিস্ময়ের তাঁহার আর সীমা থাকে না। বেশ্যাদের সেই মেয়েটাকেই তাঁহার কন্যা ভাবিয়া ইহারা তাঁহার কোলের কাছে বসাইয়া দিয়াছে!

মেয়েটা সভয়ে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। দাক্ষায়ণী শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া মাঝিদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য বলেন—"ও ত আমার মেয়ে নয়।"

মাঝিরা সবাই হাসিয়া ওঠে। বুড়া মাঝি হাসিয়া বলে, "ঠিক বলেছেন মা-ঠাকরুন, ওটা কুড়োনি মেয়ে, গঙ্গার জলে ওটাকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি—কি বলিস্ খুকী!"

খুকী মাথা নোয়াইয়া একেবারে বিছানার সঙ্গে যেন মিশাইয়া

যাইতে চায়। দাক্ষায়ণী মাঝিদের কথার ধরনে সহসা ভীত হইয়া ওঠেন, তাড়াতাড়ি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন—"ও যে সত্যি আমার মেয়ে নয়।"

কিন্তু কে সে-কথা শুনিতেছে! তাঁহার মুখের ভাবই বা কে লক্ষ্য করে। বাতাসী তখন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে শুরু করিয়াছে। বুড়া মাঝি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া বলে—"আরে এটা কি পাগলি মেয়ে, তামাসা বোঝে না! তুইও বলনা কেন, তুমি আমার মা নও!"

দাক্ষায়ণী বিহ্বল ভাবে সকলের মুখের দিকে তাকান। ইহাদের এ অদ্ভুত ধারণা কোথা হইতে জন্মিল, কেমন করিয়াই বা এ ধারণা তিনি দূর করিবেন, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না।

বাতাসী কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধ মাঝির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া যায়। দাক্ষায়ণী ক্লান্ত মনে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়েন।

ধবলাট বেশী দূরে নয়। দুপুর নাগাদ মহাজনী ভড় হইতে মাঝিরা সেখানে তাঁহাদের নামাইয়া দেয়। ইহার পর তাহাদের অন্য দিকে যাইতে হইবে। সুতরাং আর বেশী তাহারা তাঁহাদের লইয়া যাইতে পারিবে না।

বৃদ্ধ মাঝি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বিদায় লইয়া বলে,—"হুকুম নেই, মা-ঠাকরুন, নইলে আপনাদের গঙ্গাসাগর অবধি পৌঁছে দিতুম। তবে ধবলাট হয়ে হামেশা গঙ্গাসাগরে নৌকা যাবে মা—তার একটায় চেপে বসবেন।"

দাক্ষায়ণী অত্যন্ত বিমূঢ় ভাবে ভড়ের উপর হইতে নদীর পাড়ে ফেলা তক্তার উপর দিয়া নামিয়া যান।

বৃদ্ধ মাঝি ডাকিয়া বলে—"মেয়েটার হাতটা ধরে নেন মা-ঠাকরুন, বড় পেছল।"

যন্ত্রচালিতের মত দাক্ষায়ণী বাতাসীর হাতটা ধরিয়া তীরে ওঠেন।

এই কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাঁহার মনের ভিতর দিয়া যে ঝড় গিয়াছে, তাহাতে বিমূঢ় হওয়া কিছু আশ্চর্যও নয়। মাঝিদের কাছেই খবর পাইয়াছেন যে, তাঁহাদের নৌকার দু'একজন মাল্লা ছাড়া আর কেহই বোধ হয় রক্ষা পায় নাই। তাঁহার একই গ্রাম হইতে তাঁহার যে সব সঙ্গী সাথী আসিয়াছিল, তাহারা সবাই নৌকার মাঝে বন্দী হইয়া অতি শোচনীয় ভাবে ডুবিয়া মরিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের দু'জনকে ছাড়া আর কাহাকেও তাহারা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাঁহাদের দুইজনের যে মা ও মেয়ের সম্বন্ধ, এই ভুল তাহাদের আরও কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ভাঙা সম্ভব হয় নাই। তাহারা তাঁহাকে ভাঙা হালের উপর হইতে মেয়েকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে দেখিয়াছে; এবং সন্তানের জন্য ছাড়া মানুষ এমন কাজ যে করিতে পারে, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করে কেমন করিয়া! বৃদ্ধ মাঝি হাসিয়া বলিয়াছে—"নাড়ীর টান বড় টান মা-ঠাকরুন, ও কি আর লুকোবার জো আছে।"

মহাজনী ভড়এর মাঝিরা পাটা তুলিয়া ধীরে ধীরে আবার নৌকা ছাড়িয়া দেয়। সে নৌকা দূরে অদৃশ্য হওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাক্ষায়ণী বিমনা হইয়া বাতাসীর হাত ধরিয়া তীরে দাঁড়াইয়া থাকেন। তার পর সহসা সচেতন হইয়া সজোরে মেয়েটার হাত তিনি দূরে ছুঁড়িয়া দেন। তাঁহার গঙ্গাসাগর যাত্রার পথের সমস্ত দুর্ঘটনার দরুন ক্ষোভ ও রাগ এই মেয়েটার উপর গিয়া পড়ে। তাহার মুখের দিকে চাহিতে পর্যন্ত তিনি পারেন না।

বাতাসীকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করিয়া নিজের দুশ্চিন্তায় তন্ময় হইয়াই তিনি আগাইয়া চলিতে থাকেন। দুশ্চিন্তা তাঁহার বড় কম নয়। কোমরের থলেতে বাঁধা পাথেয়র টাকা তাঁহার জলে ডুবিয়াও খোয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু হাজার শক্ত হইলেও অপরিচিত স্থানে একা মেয়েমানুষ হইয়া গঙ্গাসাগর দূরের কথা, দেশে ফিরিবার ব্যবস্থাই কেমন করিয়া করিবেন, তাহা ভাবিয়া দাক্ষায়ণী আর কূল পান না।

সামনে কতকগুলো বড় বড় আটচালার চারি পাশে অনেকগুলো লোক জড় হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদেরই অনুনয় বিনয় করিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে ভাবিয়া দাক্ষায়ণী চলিতে থাকেন।

হঠাৎ ধপ্ করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া পড়িতে হয়। মেয়েটা এতক্ষণ বুঝি তাঁহার পিছু পিছুই আসিতেছিল, মাঝে একটা মাটির ঢিপিতে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে।

অত্যন্ত কটুকণ্ঠে তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে গিয়া দাক্ষায়ণী সহসা চুপ করিয়া যান। পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ধারালো একটা খোলমকুচিতে লাগিয়া মেয়েটার পা কাটিয়া একেবারে ঝুঁজিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। ইহার পর তাহাকে ধরিয়া তুলিতেই হয়। মেয়েটা অশ্রুসিক্ত ভীত মুখটা নীচু করিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়ায়। কাল রাত্রে সবে সে অনেক কষ্টে জলে ডুবিয়া মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছে! ছোট মেয়ে,—শরীর তাহার এখনও অত্যন্ত দুর্বল। হাত ধরিয়া তুলিয়া দাক্ষায়ণী দেখিতে পান পা দু'টি তাহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে!

উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেন—"হাঁটতে পারবে না?"

যত দোষই থাক, মেয়েটি নির্বোধ নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহার একান্ত নিঃসহায় অবস্থাটা তাহার সামান্য বুদ্ধিতে যতখানি

সম্ভব সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের সহিত তাহার পরিচিত মেয়েদের তফাত যে কত তাহাও সে কিছু কিছু জানে। দুই দিন আগে যাঁহাকে সে অপমান করিয়াছে, আজ তাঁহারই অনুকম্পা তাহার একমাত্র সম্বল, এইটুকু যত অস্পষ্টভাবেই হউক বুঝিয়া, সে তাঁহাকে বিব্রত করিতে ভয় পায়।

ধরা গলায় মাথা নীচু করিয়া সে বলে, 'পারব', কিন্তু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া দুই পা যাইতে না যাইতেই দুর্বলতায় মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়ে। দাক্ষায়ণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।

কোলে করিয়া এইবার তাহাকে লইয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই, কিন্তু দাক্ষায়ণীর চিরজীবনের সংস্কারে এই অশুচি মেয়েটাকে অমন করিয়া বহিয়া যাইতে অত্যন্ত বাধে। মেয়েটার পা কাটিয়া রক্ত পড়িতে দেখিয়া যেটুকু মায়া তাঁহার হইয়াছিল, তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইতে হওয়ার সম্ভাবনায় সেটুকু একেবারে উবিয়া গিয়া শুধু বিতৃষ্ণাতেই তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠে। মনে হয়, মেয়েটা ছেনালী করিয়া অজ্ঞান হইবার ভান যে করে নাই, তাই বা কে বলিতে পারে।

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া তিনি সচেতন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাতাসীর সত্যই তখন জ্ঞান নাই। সে তাঁহার গায়ে লতাইয়া পড়ে। অগত্যা দাক্ষায়ণীকে কোলে লইতেই হয়; এবং প্রত্যেক পদবিক্ষেপে জীবনের কোন্ অজ্ঞাত অপরাধে এই শাস্তি তাঁহাকে ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাই বোধ হয় বিধাতার কাছে তিনি প্রশ্ন করেন।

দূর হইতে তাঁহাদের বিপদ দেখিয়া দুই একটা লোক আপনা হইতেই আগাইয়া আসে। দাক্ষায়ণী সংক্ষেপে তাহাদের কাছে নৌকাডুবির কথা জানাইয়া সহায়তা প্রার্থনা করেন। বাতাসী সম্বন্ধে

কোন উচ্চবাচ্যই করেন না; করা যে নিষ্ফল এটুকু তিনি এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। হাতে হাতে তাহার প্রমাণও পাওয়া যায়।

মেয়েটাকে তাঁহার কোল হইতে তুলিয়া লইয়া একজন বলে "তবু ভগবানের দয়া বলতে হবে বাপু, মা মেয়ের একজনকে রেখে আরেক জনকে নেন নি!—কি সর্বনাশই তাহলে হত!"

সে রাত্রের মত গঞ্জের এক ব্যাপারীর ঘরে আশ্রয় তাঁহাদের মিলিল। ঠিক হইল পরদিন সাগরগামী কোন নৌকায় তাঁহাদের তুলিয়া দেওয়া হইবে।

পৌষ মাসের শীত। গরম কাপড় যাহা ছিল, নৌকার সঙ্গেই সমস্ত ডুবিয়াছে। ব্যাপারীরা দয়া করিয়া একটা পাতিবার কাঁথা ও একটা কম্বল জোগাড় করিয়া দিয়াছে—মায়ে-ঝিয়ে কোনরকমে তাহাতে রাত কাটাইতে পারিবে ইহাই তাহাদের ধারণা।

হোগলায় ছাওয়া নাতি-বৃহৎ মাটির ঘর এক কোণের মৃদু একটি কেরোসিনের বাতির শিখায় ভাল করিয়া আলোকিত হয় নাই। তাহারই একধারে জড়সড় হইয়া বসিয়া বাতাসী শীতে কাঁপিতেছিল। দুর্বল শরীরে ঘুম তাহার অনেকক্ষণ হইতেই পাইয়াছে, কিন্তু হোঁচট খাইয়া অজ্ঞান হইবার পর প্রথম চোখ খুলিয়া দাক্ষায়ণীর মুখের যে চেহারা সে দেখিয়াছে, তাহার পর তাঁহার সামনে এতটুকু নড়িয়া বসিবার সাহসও তাহার নাই। লোলুপ-দৃষ্টিতে উষ্ণ কম্বলটার দিকে তাকাইয়া সে তাই সভয়ে চুপ করিয়া বসিয়াই ছিল।

শীত দাক্ষায়ণীরও করিতেছিল; কিন্তু কম্বল গায়ে দিতে গেলে মেয়েটাকেও ডাকিতে হয়; এবং সমস্ত রাত ওই অপবিত্র মেয়েটার সঙ্গে শুইবার কল্পনায় তাঁহার মন কিছুতেই সায় দিতে পারিতেছিল

না অবশেষে নিরুপায় হইয়া অত্যন্ত শুষ্ক কণ্ঠে তিনি বাতাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—"বসে বসে কাঁপবার কি দরকার! এসে শোও না!"

এ আদেশের ভিতর মমতার লেশমাত্র নাই, এটুকু বাতাসীর পক্ষে বোঝা বিশেষ কঠিন নয়; তবু সসংকোচে সরিয়া আসিয়া বিছানার এক প্রান্তে কম্বলের এক অংশ মাত্র গায়ে দিয়া সে শুইয়া পড়িল।

দাক্ষায়ণী তাহার গায়ের উপর কম্বলের অন্যদিকটা ছুঁড়িয়া দিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিলেন—"আবার অত ঢঙ কেন? ও কম্বল আমি ছোঁব না। ভাল করে গায়ে দাও।"

বাতাসী কম্বলটা আর একটু টানিয়া লইল, কিন্তু ভালো করিয়া গায়ে দিতে পারিল না।

বাহিরের শীত ও নিজের মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া দাক্ষায়ণী আরও অনেকক্ষণ জাগিয়া কাটাইলেন—বাতাসী ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিছানার এক পাশে বাতাসীর কাছ হইতে সযত্নে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাঁহাকে শুইতেই হইল। কম্বলের এক প্রান্ত গায়ে দিয়া মনে মনে গঙ্গাসাগরে গিয়া স্নান করিয়া এ অশুচিতা দূর করিবেন ইহাই তিনি স্থির করিলেন।

তার পর কখন তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—মনে নাই। ভোর রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

বাতাসী কখন ঘুমের ঘোরে সরিয়া একেবারে তাঁহার বুকের কাছটিতে ঘেঁষিয়া আসিয়া শুইয়াছে—তাহার একটি হাত তাঁহার কণ্ঠে শিথিল ভাবে লগ্ন।

কেরোসিনের ডিবিয়াটা তখনও তেমনি জ্বলিতেছে। তাহার রক্তিম আলোয় মেয়েটার দিকে চাহিয়া, ওই কোমল মুখ হইতে সেদিন কি করিয়া অমন কুৎসিত কথা বাহির হইয়াছিল, কিছুতেই তিনি ভাবিয়া

পাইলেন না—সে মুখে সংসারের ভাবী সর্বনাশিনীর কোন আভাসই নাই।

তবু বহু দিনের সংস্কারে শরীরটা তাঁহার কেমন যেন সংকুচিত হইয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু কণ্ঠলগ্ন শীর্ণ শুভ্র হাতখানা সরাইতে গিয়াও সরাইতে তিনি কেন জানিনা পারিলেন না।

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে বাতাসী একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। ঘুমন্ত চোখ খুলিয়া প্রথমেই তাহার নজরে পড়িল কম্বলটি তাহার গায়ে বেশ ভালো করিয়া জড়ান। দাক্ষায়ণী ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কি যেন করিতেছেন !

হয়ত সারা রাত্রিই সে কম্বল ও বিছানা দখল করিয়াছিল,—দাক্ষায়ণীকে হয়ত সারা রাত্রিই এই শীতে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছে ভাবিয়া সে ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিতে যাইতেছিল। দাক্ষায়ণী হাত নাড়িয়া তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন,—"থাক্ থাক্ ! সকালের এই হিমে উঠে কাজ নেই। হাড় একেবারে কালিয়ে দিচ্ছে !"

তাহার পর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি শুয়ে থাক, আমি এক্ষুণি আসছি, কিছু ভয় নেই।"

বাতাসী সবিস্ময়ে আবার শুইয়া পড়িল। দাক্ষায়ণীর স্বরে অপ্রত্যাশিত যে স্নেহের আভাসটুকু ছিল, তাহাতেই অকারণে বাতাসীর কান্না যেন নূতন করিয়া উছলিয়া উঠিল। বালিশের ভিতর মুখ গুঁজিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও সে অশ্রুরোধ করিতে পারিল না।

দাক্ষায়ণী খানিক বাদেই ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল কোথা হইতে ইহারই মধ্যে কোঁচড়ে ভরিয়া মুড়ি ও গোটা কয়েক মোয়া তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন।

হাসিয়া বলিলেন, "খুব খিদে পেয়েছে—না? নে তাড়াতাড়ি এবার উঠে মুখটা ধুয়ে আয় দিকি!"

তার পর দরজার কাছে গিয়া সামনের উঁচু পাড় দেওয়া পুকুরটা দেখাইয়া বলিলেন—"ওই যে সামনে পুকুর! একলা যেতে পারবি ত! না—আমি যাব সঙ্গে?"

মৃদুস্বরে "পারব" বলিয়া বাতাসী চলিয়া গেল।

দাক্ষায়ণী পিছন হইতে আর একবার সাবধান করিয়া বলিলেন—"খুব সাবধানে নামিস্—ভারী পেছল কিন্তু!"

দুপুরবেলা সাগর যাইবার নৌকা পাওয়া গেল। দাক্ষায়ণী ইতিমধ্যে গাঙ্গের জলে ভাল করিয়া স্নান করিয়া মেটে হাঁড়িতে সামান্য ভাত ডাল ফুটাইয়া বাতাসীকে খাওয়াইয়া নিজেও কিছু খাইয়া লইয়াছেন। রান্নার ব্যাপারে বাতাসীর সাহায্য তিনি কিছু গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু আগাগোড়া দুইজনেব মধ্যে অত্যন্ত সহজে অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার ব্যবহারে সাহস পাইয়া বাতাসী মুখ খুলিতে দ্বিধা করে নাই। রান্নার জায়গা হইতে একটু দূরে বসিয়া আগাগোড়া সে নিজে হইতে অনেক কথাই কহিয়াছে—ঝাল সে মোটে খাইতে পারে না, যে লঙ্কাগুলো ছোট হয় সেগুলোর ঝাল বেশি ইত্যাদি—

দাক্ষায়ণী একটু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, "যেমন তুই!"

ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জভাবে হাসিয়া বাতাসী মুখ নীচু করিয়াছে।

তার পর একটু দূরে দূরে কলাপাতা করিয়া খাইতে বসিয়াও কম তাহাদের কথা হয় নাই।

দাক্ষায়ণী স্নান করার পর ভিজা কাপড়েই রান্না করিয়া খাইতে বসিয়াছিলেন।

বাতাসী জিজ্ঞাসা করিয়াছে,—"ভিজে কাপড়ে শীত করছে না ?"

দাক্ষায়ণী একটু হাসিয়া বলিয়াছেন, "শীত করলে আর কি করছি বল্! তুই ত একটা কাপড় দিবি না।"

বাতাসী বলিয়াছে, "আমার কাপড় যে সব ডুবে গেছে।"

"তা না হলে দিতিস্—কেমন ?"

বাতাসী লজ্জায় আর কিছু বলিতে পারে নাই। খানিক বাদে কিন্তু, তাহার ভাল ডুরে কাপড়টা পরিয়া থাকিলে যে তাহা হারাইত না, ঘরে তাহার যে সত্যকার সিল্কের একটা কাপড় আছে, ইত্যাদি অনেক কথাই সে গল্প করিয়াছে।

এই গল্পের সম্পর্কে বাতাসীর জীবনের আবেষ্টনের কথা বারে বারে স্মরণ হওয়ায় দাক্ষায়ণী একটু অস্বস্তি অনুভব করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বাতাসীর উপর আগেকার বিরাগ তাঁহার কখন দূর হইয়া গিয়াছে তিনি জানিতেও পারেন নাই।

কিন্তু এত মোলায়েম ভাবে এই দুইটি কক্ষভ্রষ্ট প্রাণীর সম্বন্ধ বেশীক্ষণ গড়িয়া উঠিতে পারে না।

দাক্ষায়ণীর ব্যবহারে ভরসা পাইয়া বাতাসীর ভয় ও আড়ষ্টতা ক্রমশঃ দূর হইয়া আসিতেছিল।

সাগরে যাইবার নৌকায় উঠিবার সময় হঠাৎ সে মুখ বাঁকাইয়া ঘাড় দোলাইয়া তাহার বয়সের পক্ষে অত্যন্ত বিসদৃশ এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আর নৌকায় উঠতে পারিনে বাবা! জল যেন আমার দু'চক্ষের বিষ! বলে, আর জলে যাব না সই..."

১৭৮৬

কিন্তু ওই পর্যন্ত বলিয়াই দাক্ষায়ণীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই আটকাইয়া রহিয়া গেল—ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল।

দেখা গেল দাক্ষায়ণীর মুখ এক মুহূর্তে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। বারেক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হনহন করিয়া তিনি সোজা নৌকার উপরে উঠিয়া গেলেন—বাতাসী উঠিতেছে কি না একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

নিজেকেই তিনি বোধ হয় মনে মনে ধিক্কার দিতেছিলেন। কেউটের ছানার আসল রূপ সমস্ত আবরণের তলা হইতে সহসা প্রকাশ যদি হইয়া থাকে, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি সব জানিয়া শুনিয়া এ মেয়েটির শুধু মুখখানি দেখিয়া খানিকক্ষণ এমন আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন কেমন করিয়া!

দাক্ষায়ণীর সমস্ত শরীর মেয়েটার কদর্য ভঙ্গী স্মরণ করিয়া রি-রি করিতেছিল। দেহে ও মনে তাহার কত দিনের কত মানুষের পাপের ক্লেদ যে সঞ্চিত হইয়া আছে, কে জানে! আর তিনি খানিকটা আগে ইহারই সঙ্গে কি না হাসিয়া কথা কহিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, একটু মায়াই তাঁহার মেয়েটার উপর পড়িতে শুরু হইয়াছিল।

তাঁহার পবিত্র পিতৃ ও শ্বশুর কুল স্মরণ করিয়া দাক্ষায়ণী মনে মনে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গঙ্গাসাগরে নামিয়াই এই মেয়েটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদনের একটা ব্যবস্থা করিবেন, ইহাও তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে ভুলিলেন না।

অত্যন্ত হতাশ মনমরা ভাবে বাতাসী তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আশে পাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল—চোখ দুইটা তাহার জলে তখন ছলছল করিতেছে। কিন্তু দাক্ষায়ণী দেখিয়াও তাহাকে দেখিলেন না।

বাতাসী তাহার সামান্য বুদ্ধিতে চেষ্টার ক্রটি করিল না। বড়

মহাজনী নৌকা—মাঝি মাল্লা ও তাঁহারা দুইজন ছাড়া যাত্রী একটিও নাই—গঙ্গাসাগরে দোকান খুলিবার জন্য তাহারা নৌকা বোঝাই মাটির খেলনা পুতুল ইত্যাদি লইয়া চলিয়াছে।

শুধু দাক্ষায়ণীকে কথা কহাইবার জন্যই অত্যন্ত সংকুচিত ভাবে সে একবার সেই পুতুলগুলির দিকে চাহিয়া বলিল—"আমার ওই রকম একটা টিয়া পাখি আছে—ওর চেয়েও বড়!"

কিন্তু দাক্ষায়ণী যেমন চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিলেন তেমনি রহিলেন—ঘুমাইতেছেন কি জাগিয়া আছেন বোঝা গেল না।

বাতাসী আর একবার সভয়ে বলিল—"এ নৌকাটা খুব বড়। বড় নৌকা ডোবে না—না?"

দাক্ষায়ণী তেমনি নিরুত্তর।

বাতাসী আর একবার হতাশ ভাবে শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমি খুব ভাল পা টিপতে পারি।"

কিন্তু পায়ে হাত দিতেই পা-টা সরাইয়া লইয়া দাক্ষায়ণী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"থাক।"

অপরাধীর মত সসংকোচে হাতটা সরাইয়া লইয়া বাতাসী বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—দাক্ষায়ণীর প্রসন্নতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আর কি করা যায় কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না।

চাপা কান্নায় গলার কাছটায় কি একটা জমাট বাঁধিয়া তাহার নিশ্বাস যেন রোধ হইয়া আসিতেছিল। ভাল করিয়া কাঁদিতে পারিলে বুঝি তাহার খানিকটা তৃপ্তি হইত, কিন্তু সে সাহস তাহার হইল না। শুধু দু'টি গাল বাহিয়া নীরবে অজস্র ধারে যে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা সে কোন মতেই নিবারণ করিতে পারিল না।

ধবলাট হইতে গঙ্গাসাগর বেশী দূরে নয়। পালে ভাল হাওয়া

পাইয়া তাহাদের নৌকা খুব তাড়াতাড়িই চলিয়া আসিয়াছে। এখন বারদরিয়ার সামান্য একটু অংশ পার হইলেই হয়। কিন্তু এতদূর এমন নির্ঝঞ্ঝাটে আসিবার পর এই খানেই এমন বিপদ ছিল তাহা দাক্ষায়ণী জানিতেন না।

নৌকায় উঠিবার পর অনেকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। তাহার পর বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে উঠিয়া মাঝিদের কাছে গঙ্গাসাগরে থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে হইয়াছে। সঙ্গের সাথী কেহ নাই—একাই তাঁহাকে যাহা কিছু সব করিতে হইবে। নিজে একলা হইলেও যাহোক ভাবনা ছিল না; সঙ্গে আবার এই মেয়েটা জুটিয়াছে—দাক্ষায়ণীর একটু দুর্ভাবনা হওয়া স্বাভাবিক।

মেয়েটা এতক্ষণ ধরিয়া বরাবর তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছে; কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই তিনি তাহার দিকে দৃষ্টি দেন নাই।

কিছুক্ষণ হইতে নৌকা একটু দুলিতেছিল।. আপাততঃ নৌকার কামরার বাহিরে আসিয়া তাহারই কারণ তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার পায়ের তলা হইতে নৌকাটা যেন মনে হইল সবেগে সরিয়া যাইতেছে। বাতাসী 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া পিছন হইতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে সামনে টানিয়া বুকের কাছে তুলিয়া ভীত পাংশু মুখে দাক্ষায়ণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার নিশ্চিত ধারণা হইল—নৌকা আবার ডুবিতেছে।

মাঝিরা আসিয়া ধরিয়া না ফেলিলে আতঙ্কে তিনি কি যে করিয়া ফেলিতেন বলা যায় না। তাহারা একরকম জোর করিয়াই তাঁহাদের নৌকার কামরায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া জানাইল যে, ভয় করিবার ইহাতে কিছু নাই—সাগরের ঢেউ লাগিয়া নৌকা খানিকটা এইরূপ করিবেই।

কিন্তু দাক্ষায়ণী আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। মেয়েটাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে অত্যন্ত অবোধের মত বলিলেন,—"আমাদের না হয় কোথাও নামিয়ে দাও বাবা! আমরা না হয় হেঁটেই যাব।"

এখানে যে চারিধারে জল ছাড়া নামিবার স্থান কোথাও নাই, এবং থাকিলেও, সেই জনহীন শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলে নামার অর্থ যে নিশ্চিত মৃত্যু, এ কথা মাঝিরা তাঁহাকে কোন মতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারিল না।

প্রত্যেক ঢেউএর দোলার সঙ্গে নিতান্ত নির্বোধের মতই তিনি জেদ করিতে লাগিলেন—"আমার কাছে যা আছে সব নাও বাবা, আমাদের নামিয়ে দাও। জঙ্গল হোক যা'হোক, শক্ত মাটি ত বটে,—আমরা যা হোক করে হেঁটে পেরিয়ে যাব।"

অবশেষে কোন মতে বুঝাইতে না পারিয়া মাঝিরা বিরক্ত হইয়া তাহাদের কাজে চলিয়া গেল।

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া দাক্ষায়ণী পাংশু মুখে সেই ঘরে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শুধু বাতাসীকে বুক হইতে নামাইবার কথা বুঝি তাঁহার মনে ছিল না।

গঙ্গাসাগরে শেষ পর্যন্ত তাঁহারা নিরাপদেই পৌঁছিয়াছেন। যাত্রীদের থাকিবার উপযোগী বালির উপরে হোগলার একটা ঘরও ভাড়া মিলিয়াছে। সেচ্ছাসেবক ও পুলিসের ব্যবস্থা ভাল; দাক্ষায়ণীকে কোন ব্যাপার লইয়া একলা হইলেও বিশেষ বিপদে পড়িতে হয় নাই। কিন্তু প্রত্যেক দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষায়ণীর দুশ্চিন্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বাতাসীকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া তিনি আর কূল কিনারা পান না।

মেয়েটা কয়দিনে যেন একেবারে নব জন্মলাভ করিয়াছে। কে জানে আগেকার জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ তাহার গভীর হয় ত ছিল না! যে রকম সহজে সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইয়াছে, তাহাতে সেই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কে বলিবে দাক্ষায়ণীর সঙ্গে চিরদিনের সম্পর্ক তাহার নয়!

কখন হইতে যে বাতাসী তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে, তাহা দাক্ষায়ণীর স্মরণ হয় না; কিন্তু কেন বলা যায় না—এ ডাক তাঁহার কোথাও আর বেঁধে না।

তাঁহার উঠিবার আগেই ভোর রাত্রে বাতাসী জাগিয়া তাঁহাকে ডাকে,—"এখনো ঘুমোচ্ছ! আজ সেই যে সূয্যি ওঠবার আগে কি করতে হয় বলেছিলে না?" তাহার পর দাক্ষায়ণীর সাড়া না পাইয়া আর একবার নাড়া দিয়া বলে—"ও মা, শুনছ?"

দাক্ষায়ণী পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলেন—"তুই কি পাগল!—এখনো সূয্যি ওঠবার অনেক দেরি—নে শো!"

তাহার পর শুইয়া শুইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিয়া বলেন—"ও মা, শিশিরে যে একেবারে ভিজে গেছে কম্বলটা। দেখি —গা ভেজেনি ত।"

"না গো না, গা ভিজবে কেন, নিচে আবার একটা চট দিয়ে দিলে না শোবার আগে।"

দাক্ষায়ণী আশ্বস্ত হইয়া বলেন,—"নে, তা হলে শুয়ে পড়।"

বাতাসীর কিন্তু আর শুইবার ইচ্ছা নাই। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে,—"বাবা, ওই বিশমুনী কম্বল আর চট গায় দিয়ে শুতে পারি না। ওই ত সবাই উঠে পড়েছে, ওঠ না তুমি।"

শীতের ভিতর সহজে কম্বল ত্যাগ করিতে দাক্ষায়ণীর ইচ্ছা হয় না —চোখ বুজিয়াই বলেন,—"বৃষ্টি পড়ছে শুনতে পাচ্ছিস্ না। থরুক বৃষ্টি একটু।"

বাতাসী বলে,—"আহা, ও বুঝি বৃষ্টি, চাল থেকে শিশিরের জল পড়ছে ত।"

ব্যাপারটা সত্যই তাই; হোগলার বেড়া দেওয়া যাত্রীঘরগুলির চালাও হোগলা দিয়া যেমন-তেমন করিয়া ছাওয়া। শীতের সারা রাত্রের শিশিরে তাহা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। সেই চাল ভেদ করিয়াই শিশিরের জল চারি ধারে বালির উপর টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে থাকে।

অগত্যা দাক্ষায়ণীকে উঠিতে হয়। বলেন—"গঙ্গাসাগরের সব পুণ্যি তুই একাই করে নিয়ে যাবি দেখছি।"

বাতাসী সলজ্জ হাসিয়া বলে—'আহা'।

গঙ্গাসাগরে থাকিবার দিন ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতেছে—দু' একদিন দেরি করিলেও দেশে শীঘ্রই ফিরিতে হইবে। বাতাসীকে লইয়া তখন কি করিবেন, দাক্ষায়ণী কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না।

যত আপনারই সে হইয়া উঠুক,—তাহার প্রতি মায়া যে বেশ খানিকটা পড়িয়াছে ইহা অসংকোচে নিজের মনে স্বীকার করিতে বাধা না থাকুক,—তাহাকে যে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাওয়া যায় না, এ কথা দাক্ষায়ণী ভাল করিয়াই জানেন।

মিথ্যা তিনি বলিতে পারিবেন না। পরিচয় গোপন করিয়া ইহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহার শ্বশুরকুলের অপমান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। লোকে যদি কিছু সন্দেহ নাও করে, তবু জানিয়া

শুনিয়া তাঁহাদের পবিত্র পরিবারে এই কলঙ্কিত-জন্মা মেয়েটিকে তিনি কেমন করিয়া স্থান দিবেন।

বাতাসীকে ছাড়িতেই হইবে; কিন্তু কেমন করিয়া? এ-রকম অনাথ ছেলে-মেয়ের ভার কাহারা লয় কিছুই তাঁহার জানা নাই। জানা থাকিলেও, সেখানে বাতাসীর অনিষ্ট হইবে না, এ কথা তাঁহার বোধ হয় বিশ্বাস হইত না।

দুর্ভাবনায় দাক্ষায়ণীর সময় সময় মাথার ঠিক থাকে না।

বাতাসী কথা কহিয়া জবাব পায় না।

দাক্ষায়ণী হঠাৎ হয়ত রুক্ষ স্বরে বলেন—"জ্বালাতন করিসনি, ভাল লাগে না বাপু! দু'দণ্ড সোয়াস্তি পাবার উপায় নেই, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়েছি তোকে নিয়ে!"

বাতাসী নীরব হইয়া যায়, শুধু চোখ দুইটা তাহার অল্পেই সজল হইয়া আসে।

খানিক বাদে কি ভাবিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া দাক্ষায়ণী আবার বাহির হইয়া পড়েন। এটা সেটা দেখাইয়া, নানান গল্প করিয়া আবার বাতাসীর মুখে হাসি ফুটাইতে তাঁহার দেরি লাগে না।

এক এক সময়ে তাঁহার মনে হয়, বাতাসীর জন্য এত ভাবিবার দায়ই বা তাঁহার কিসের? কোথাকার কলুষিত সমাজের একটা মেয়ে, দৈবাৎ কয়েক দিনের জন্য তাহার জীবন তাঁহার সহিত জড়াইয়া গেছে মাত্র। এ বন্ধনকে স্বীকার করিবার কোন দায়িত্বই ত তাঁহার নাই। তাঁহার সঙ্গ না পাইলেও বিধাতার সংসারে তাহার একটা কোন কিনারা হইতই,—আজ তিনি তাহাকে ছাড়িয়া গেলেও তাহার যেমন হোক একটা আশ্রয়ের অভাব হইবে না! আর পাপের পঙ্কের মধ্যে যে আশৈশব লালিত, তাহার পক্ষে আর আশ্রয়ের ভালো-মন্দ কি?

স্নানের যাত্রীদের ভিড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে দাক্ষায়ণীর মনে হঠাৎ অদ্ভুত এক খেয়ালের উদয় হয়।

এই গঙ্গাসাগরেই তাহাকে ফেলিয়া কোন রকমে লুকাইয়া তিনি ত বেশ চলিয়া যাইতে পারেন। যাহার সহিত অতীতে কোন সম্বন্ধ ছিল না, ভবিষ্যতে যাহার সহিত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না, তাহাকে এ ভাবে পরিত্যাগ করার ভিতর অন্যায়ও ত কিছু নাই। সব সমস্যার অতি সহজেই তাহা হইলে মীমাংসা হইয়া যায়, দুর্ভাবনার গুরুভার নামাইয়া তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতে পারেন।

ভিড় ঠেলিয়া অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দাক্ষায়ণীর নজরে পড়ে বাতাসী তাঁহার পিছনে নাই। এই খানিক আগেও তাহাকে পিছুপিছু আসিতে যে তিনি দেখিয়াছেন। না, এ নির্বোধ মেয়েটাকে লইয়া আর পারা গেল না,—পথ চলিতে চলিতে চারিদিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকা তাহার ভারী বদ স্বভাব। একটু অসাবধান হইলেই সে পিছাইয়া পড়ে।

দাক্ষায়ণী খানিক দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেন। কিন্তু তবু বাতাসীর দেখা নাই। এবার তাঁহার রাগ হয়। পই পই করিয়া এ কয় দিন তিনি তাহাকে রাস্তায় সঙ্গ-ছাড়া হইতে বারণ করিয়াছেন। অজানা অচেনা জায়গায় বয়স্ক লোকেরাই পথ চিনিতে হয়রান হয়। চারি দিকে একই ধরনের হোগলার কুঁড়ের সার,—একটার সঙ্গে আর একটার কোন তফাত নাই। ইহার ভিতর একবার হারাইলে খুঁজিয়া বাহির করা কি কম কষ্টকর!

দাক্ষায়ণী একটু আগাইয়া যান। তবু বাতাসীর পাত্তা নাই।

এবার তাঁহার ভয় হয়। হাবা মেয়েটা এই ভিড়ের ভিতর কোন্ দিকে যাইতে কোন্ দিকে গিয়াছে কে জানে। একলা ত সে পথ চিনিয়া আসিতে পারিবেই না, কাহাকে জিজ্ঞাসাও যে করিবে সে

উপায়ও নাই। মাঝির নামেই এখানকার বসতির পরিচয়—সে নাম ত সে জানে না।

দাক্ষায়ণী চীৎকার করিয়া ডাকেন,—"বাতাসী"।

সাড়া না পাইয়া তিনি আরো অগ্রসর হইতে থাকেন। স্নান হইতে যাহারা ফিরিতেছে তাহাদের অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সুবিধা হয় না। দাক্ষায়ণী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ওঠেন।

শেষ পর্যন্ত বাতাসীকে সেদিন পাওয়া যায়।

অনেক ঘোরার পর হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়ে একটা দোকানের ধারে কয়েকটা লোক ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে চেঁচামেচি করিতেছে। ভিড় সরাইয়া মুখ বাড়াতেই রোরুদ্যমানা বাতাসী একেবারে ঝাঁপাইয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে।

এতক্ষণের উদ্বেগ ও আশঙ্কা এবার দাক্ষায়ণীর রাগে পরিণত হয়। ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া তিনি বলেন,—"বলেছিলুম না, আমার হাত ছাড়িয়ে যাস্নি। আর যাবি একলা!"

আশপাশের লোকেরা তাড়াতাড়ি নিষেধ করিয়া বলে,—"আহা মেরো না, মেরো না, মেয়েটা এতক্ষণ কেঁদে একেবারে সারা হয়েছে!"

একজন বলে,—"কিন্তু কি হাবা মেয়ে তোমার মা! অতবড় মেয়ে তা জিজ্ঞেস করলে কারু পরিচয় বলতে পারে না! শুধু বলে মার সঙ্গে এসেছি!"

বাতাসী কিন্তু এ চড় বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া দাক্ষায়ণীর কোলের কাছে মুখ লুকাইয়া একসঙ্গে অশ্রু ও হাসিমাখা মুখে বলে,—"তুমি এগিয়ে গেলে কেন?"

একটু নির্জনে আসিয়া দাক্ষায়ণী জিজ্ঞাসা করেন—"আচ্ছা, আজ যদি তোকে ফেলে পালিয়ে যেতুম ?"

বাতাসী হাসিয়া, বড়বড় চোখ দুইটা তাঁহার মুখের পানে পরম নির্ভরতায় তুলিয়া ধরিয়া বলে "ঈস্"।

সেদিন রাত্রে বাতাসী আর কিছু খাইতে চাহিল না। একটু সর্দির সঙ্গে চোখ দুইটা তাহার লাল হইয়াছে। দাক্ষায়ণী গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—একটু উত্তাপ আছে। খাওয়ার জন্য আর পীড়াপীড়ি তিনি করিলেন না।

রাত্রে হোগলার ছাউনিতে হিম আটকায় না। ভাল করিয়া তাহাকে গরমে রাখিবার জন্য দাক্ষায়ণী একটা বাড়তি কম্বল কিনিয়াই আনিলেন। কিন্তু দেখা গেল জ্বর তাহার বাড়িয়াছে।

সকালে তাহার অবস্থা দেখিয়া ভয়ে দাক্ষায়ণী একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িলেন। দেহে অসহ্য উত্তাপ, মুখ চোখ ফুলিয়া রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হইয়া বাতাসী তখন ভুল বকিতেছে।

স্বেচ্ছাসেবকদের স্থাপিত সেবাশ্রম হইতে একজন প্রতিবেশী দয়া করিয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া দিল। তিনি আসিয়া পরীক্ষা করিয়া যাহা বলিলেন তাহাতে দাক্ষায়ণীর বুক একেবারে শুকাইয়া গেল।

কঠিন নিউমোনিয়া! বাতাসীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় নাই।

হাসপাতালের প্রতি দাক্ষায়ণীর আজন্ম অবিশ্বাস। তিনি কিছুতেই রাজী হইতে চাহেন না।

ডাক্তার বুঝাইল যে এ রোগের জন্য ঘণ্টায় ঘণ্টায় যেরূপ সতর্ক

শুশ্রূষা ও ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন, তাহা দাক্ষায়ণীর অস্থায়ী আবাসে হওয়া অসম্ভব। মেয়েকে বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকিলে হাসপাতালে দেওয়াই উচিত।

শেষ পর্যন্ত দাক্ষায়ণীকে বাতাসীর কথা ভাবিয়াই রাজী হইতে হইল। স্বেচ্ছাসেবকরা আশ্বাস দিয়া গেল যে ভয়ের কোন কারণ নাই। থাকিতে না পারিলেই যখন খুশী তিনি সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারিবেন। তাঁহার মেয়ের শুশ্রূষার ত্রুটি হইবে না।

হাসপাতাল পর্যন্ত বাতাসীকে পৌঁছাইয়া আসিয়া দাক্ষায়ণী যখন পথে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল, তাঁহারও দেহ মন যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে।

আজ স্নানের শেষ দিন। অসংখ্য যাত্রী ঠেলাঠেলি করিয়া সাগর-সঙ্গমে চলিয়াছে। ভিড়ের ভিতর যন্ত্রচালিতের মত তিনিও সেই দিকে চলেন; কিন্তু মনে হয়, এসব কিছুরই যেন তাঁহার আর প্রয়োজন নাই। সামান্য একটা অপরিচিত মেয়ে কয়দিনের পরিচয়ে তাঁহার সমস্ত জীবনের ধারা যেন বদলাইয়া দিয়াছে। নিষ্ঠা, ধর্ম, পুণ্য কিছুরই যেন আর সে অর্থ নাই।

পদে পদে আজ ফিরিয়া বাতাসী আসিতেছে কি না দেখিবার প্রয়োজন নাই। দণ্ডে দণ্ডে কাহারও অনর্গল প্রশ্নের জবাব দিতে আজ বিব্রত হইতে হয় না। স্নান করিতে গিয়া বেশী ডুব দিয়া ফেলিল কি না, তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বেশী দূরে গিয়া পড়িল কি না, সাঁতার কাটিবার নিষ্ফল চেষ্টায় পাশের কাহারও গায়ে জল ছিটাইয়া স্নানের বিঘ্ন ঘটাইল কি না, এ সব সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিবার দায় হইতে

তিনি মুক্ত, নির্বিঘ্নে পুণ্য কাজ সারিবার কোন বাধাই আজ নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার মনে হয়, বুঝি পুণ্যের সব আকর্ষণও তাঁহার গিয়াছে।

স্নান করিয়া উঠিবার পর তাঁহার মন কিন্তু কতকটা যেন শান্ত হয়। মনে হয়, মায়া তাঁহার যত বেশীই হোক, বাতাসীর জীবন-দীপ যদি এমনি করিয়াই নিভিয়া যায়, তাহা হইলেও দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু তাঁহার নাই। কিছু দিন বাদেই ত তাঁহাকে যেমন করিয়া হোক ওই হতভাগিনী মেয়েটির সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইত, তাহার পর এই নিষ্ঠুর উদাসীন সংসারে, ওই অনাথ অসহায় মেয়েটির জীবন পাপ ও গ্লানির কোন্ অন্ধকার অতলে তলাইয়া যাইত কে বলিতে পারে! কলুষের মধ্যে যার জন্ম, পাপের বীজ যাহার মধ্যে হয় ত সুপ্ত হইয়া আছে, সংসারের বিষতরু রূপে পল্লবিত হইয়া উঠিবার পূর্বে এই নিষ্কলুষ শৈশবে বিধাতা যদি তাহাকে ডাকিয়া লন—তাহা হইলে দুঃখ করিবার সত্যই যে কিছুই নাই।

বাঁচিলে যখন তাহার অশেষ দুর্গতি, তখন বাতাসীর মরাই ভালো।

কিন্তু স্নানের পর মেলার বাজার হইতে ফিরিবার সময় দেখা যায় দাক্ষায়ণীর দুই হাত খেলনায় ও পুতুলে বোঝাই।



বেলা যত বেশী বাড়িতে থাকে, দাক্ষায়ণী তত বেশী অস্থির হইয়া ওঠেন। এবং সমস্তক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মনের ভিতর যে আলোড়ন চলে, তাহার খবর অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই বুঝিতে পারে না।

বাতাসীর মরাই ভাল। কিন্তু সে মরিতেছে ভাবিয়া তাঁহার সারা গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। তাঁহার বিশ্ব-সংসার ঐ মেয়েটিকে কেন্দ্র করিয়া কখন হইতে ঘুরিতে শুরু করিয়াছে, তিনি জানিতেও পারেন নাই

বিকাল হইতে না হইতেই তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সমস্ত সংস্কারের চাহিতে যাহা পুরাতন—সমস্ত ধর্মের অপেক্ষা যাহা প্রবল, সেই মাতৃত্বের বিপুল আকাঙ্ক্ষার প্লাবনে তাঁহার মনের সমস্ত সংকীর্ণ সীমার বেড়া তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিধাতার কাছে বার বার আকুল ভাবে বাতাসীর জীবন-ভিক্ষা চাহিয়া তিনি মনে মনে বলিয়াছিলেন—বাতাসী তাঁহার বাঁচুক, তাহাকে লইয়া সমস্ত সংসারের নিন্দা, অপবাদের বোঝা তিনি নির্ভয়ে মাথা পাতিয়া লইবেন। শ্বশুর-বাড়ীতে স্থান না হয় তিনি তাহাকে লইয়া তাঁহার বাপের বাড়ী বা যেখানে খুশি চলিয়া যাইবেন।

কিন্তু সে আগে বাঁচুক।

কিছুক্ষণ আগে বাতাসীর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ভাবিয়াছিলেন বলিয়া নিজের প্রতি তাঁহার ঘৃণার আর সীমা থাকে না। পথে যাইতে যাইতে অনেক কথাই তাঁহার মনে হয়। বাতাসীর যে কলুষের মধ্যে জন্ম তারই বা প্রমাণ কি? গণিকারা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য ভদ্র-পরিবারের ছোট মেয়ে চুরি করিয়া লইয়া আসে, একথা তিনি শুনিয়াছেন। বাতাসী যে তেমনি কোন সদ্বংশের মেয়ে নয়—তাই বা কে বলিতে পারে? সদ্বংশে জন্ম না হইলে এত শীঘ্র তাহার এমন পরিবর্তন হইত না, এই কথাটাই বিশেষ করিয়া তাঁহার মনে হয়। যে অপরাধ তাহার নয়, ভাগ্যের দোষে তাহারই শাস্তি তাহাকে সারা জীবন বহন করিতে হইবে, এ কথায় এখন দাক্ষায়ণীর মন আর

কিছুতেই সায় দিতে পারে না। যত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, হোক, বাতাসীকে ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করিয়া একাকী তিনি দেশে ফিরিবেন না, তাহাকে সঙ্গেই লইয়া যাইবেন এই তিনি সঙ্কল্প করেন।

প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলিয়া সাগরের যাত্রীদের হাসপাতাল বসান হইয়াছে। দাক্ষায়ণী তাহার আশে পাশে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করিয়াও কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা পান না।

কি যে শুনিতে হইবে কে জানে! আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিতে থাকে! অবশেষে অনেক কষ্টে একজন স্বেচ্ছাসেবককে তিনি ভয়ে ভয়ে বাতাসীর কথা জিজ্ঞাসা করেন।

ছেলেটি সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া লয়।

"আপনি দেখতে চান ত তাকে? একটু দাঁড়ান, আমি খোঁজ নিয়ে আসি।" বলিয়া তার পর ছেলেটি চলিয়া যায়।

দাক্ষায়ণী কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করেন। কিন্তু অনেকক্ষণ কাটিয়া যায়, ছেলেটির আর দেখা মেলে না। দাক্ষায়ণী ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অস্থির হইয়া ওঠেন। কেন তিনি ইহাদের কথা শুনিয়া হাসপাতালে পাঠাইতে রাজী হইয়াছিলেন ভাবিয়া তাঁহার আফসোসের আর সীমা থাকে না।

ডাক্তার বলিয়াছিল—দেখা করিবার কোন অসুবিধাই হইবে না। এখন এই দেরি দেখিয়া ইহাদের সমস্ত ব্যাপারের উপর তাঁহার গভীর অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। কে জানে হয়তো কোন শুশ্রূষাই ইহারা বাতাসীর করে নাই। হয় ত রুগ্ন মেয়েটাকে অবহেলায় কোন্ কোণে ইহারা ফেলিয়া রাখিয়াছে, তৃষ্ণায় এককোঁটা জল দিবারও সেখানে লোক নাই। দাক্ষায়ণীর মন রাগে দুঃখে দুর্ভাবনায় কেমন যেন

করিতে থাকে। ইচ্ছা হয় এই কাপড়ের পর্দা ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া তিনি জোর করিয়া বাতাসীকে ছিনাইয়া লইয়া আসেন। বাতাসী ইহাদের ঔষধ না খাইয়াও বাঁচিবে।

দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পান, ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সেই ছেলেটি তাঁহারই দিকে আসিতেছে।

নিকটে আসিয়া দাঁড়াইবার আগেই তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহার আর কিছু বুঝিতে বাকী থাকে না। কাঠ হইয়া তিনি কোন মতে দাঁড়াইয়া থাকেন। পাথরের মত নিস্পন্দ, সে মুখ দেখিয়া তাঁহার বেদনার কোন পরিমাপই করা যায় না।

ডাক্তার আমতা আমতা করিয়া যাহা বলে, তাহার সব কথা তাঁহার কাণে যায় না, প্রয়োজনও নাই।

ডাক্তারের কথা শেষ হইবার পূর্বেই তিনি পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করেন। বাতাসীকে শেষ দেখা দেখিতে পর্যন্ত তিনি চাহেন না।

ডাক্তার তাঁহার সঙ্গে একটু আগাইয়া আসিয়া অত্যন্ত সংকুচিত-ভাবে বলে,—"আর একটু দরকার আছে আপনাকে। আপনার মেয়ের দাহ আমরাই করব। একটু পরিচয় তাই দিয়ে যেতে হবে।"

দাক্ষায়ণী ফিরিয়া শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন—"পরিচয়?"

"হাঁ, এই বয়স, বাপের নাম,—এই সব।"

দাক্ষায়ণী খানিক চুপ করিয়া থাকেন, তার পর সুপবিত্র মুখুজ্যে পরিবারের বড়বৌ, জীবনের সমস্ত সংস্কার ও শিক্ষা ভুলিয়া যাহা করিয়া বসেন তাহাতে তাঁহার শ্বশুরকুলের চতুর্দশ পুরুষ সুদূর স্বর্গের সুখবাসে শিহরিয়া ওঠেন কি না জানি না, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে জীবন-দেবতার মুখ বুঝি প্রসন্নই হইয়া ওঠে।

বলেন,—"সব ত মুখে বলতে নেই। দিন লিখে দিচ্ছি।"

হয়ত—'

গভীর দুর্যোগের রাত্রি…

অন্ধকার আকাশে মেঘে মেঘে যে বিপুল সংঘর্ষ বাধিয়াছে তাহা চোখে দেখিবার উপায় নাই, কিন্তু পৃথিবীর উপর তাহার প্রতিক্রিয়া দেখিয়া সে সংঘর্ষের ভীষণতা অনুমান করিতে কষ্ট হয় না।

ভীত শহর যেন এই অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেকে সংকুচিত করিয়া গোপন রাখিতে চায়।

নির্জন পথের যেখানে সেখানে গ্যাসের আলো পড়িয়াছে, সেখানে মাটি আর চোখে পড়ে না—শুধু বৃষ্টিধারাহত জল চিকচিক করিতেছে দেখা যায়। পথের ধারের গাছগুলি ঝড়ের তাড়নায় অসহায় বন্দীর মত মাটির শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমনি রাত্রিতে আকাশের উৎপীড়নে বিপর্যস্ত পৃথিবীকে হঠাৎ বড় অসহায় বলিয়া মনে হয়। অকস্মাৎ যেন এই ক্ষুদ্র গ্রহটির দুর্বল কয়েকটি প্রাণীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর হতাশায় মন আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

পথের ধারের গ্যাসের আলোগুলি কেমন নিষ্প্রভ হইয়া গেছে—সমস্ত মানব-জাতির আশার সঙ্গে কেন জানিনা তাহার একটি উপমা বার বার মনে আসিতে চায়।

বাস্ হইতে নামিয়া নির্জন কর্দমাক্ত পথ দিয়া, বৃষ্টির ঝাপ্‌টা হইতে দেহকে বাঁচাইবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে করিতে এমনি সব চিন্তা লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। কিন্তু মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অস্পষ্ট হতাশা ছাড়া আরেকটি ভয় মনের গোপনে ছিল—সে আশঙ্কা ব্যক্তিগত ও তাহার হেতু অত্যন্ত স্পষ্ট।

পথ অনেকখানি ; মাঝে একটা নতুন অর্ধসমাপ্ত সেতু পার হইতে হইবে। সেতুটি এখনও চলাচলের উপযুক্ত হইয়া ওঠে নাই। চলিবার রাস্তা সঙ্কীর্ণ। ধারের রেলিং দেওয়া হয় নাই। সাধারণ অবস্থাতেই এক একটি কাঠের তক্তার উপর সন্তর্পণে পা রাখিয়া চলিতে হয়—এই দুর্যোগের রাত্রে সে সেতু পার হইতে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। মনে মনে সেই বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্যই সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছিলাম।

পোলের নিকট আসিয়া কিন্তু অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। সারা-দিনের ভিতর পোলটির নির্মাণকার্য বেশ অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ধারে রেলিং দেওয়া হয় নাই কিন্তু কাঠের তক্তার ফাঁক দিয়া গলিয়া পড়িবার ভয় আর নাই—কাঠগুলি মজবুত করিয়া ইতিমধ্যে জোড়া হইয়াছে।

ঝড়ের বেগে চেন দিয়া ঝোলান পোলটি দুলিতেছিল। ভয় যে একটু না হইতেছিল এমন নয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মরিয়া হইয়াই তাহার উপর পা বাড়াইয়া দিলাম। পোল না পার হইলে এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া আরো এক মাইল পথ ঘুরিয়া যাইতে হয়।

পা দিয়াই বুঝিলাম ঝড়ের সহিত যুঝিয়া এই দোদুল্যমান পোল পার হওয়া সহজ কথা নয়। শুধু সাহস নয়, শক্তিরও প্রয়োজন। ঝড়ের বেগ খোলা নদীর উপর এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে যে প্রতি মুহূর্তেই একেবারে নদীতে পড়িবার সম্ভাবনা।

লোকজন কেহ কোথাও নাই। এই জনহীন সেতুর উপর অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া হামাগুড়ি দিয়া গেলেই বা ক্ষতি কি—চিন্তা করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময়—

থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পোলের এপার হইতে একটি টিম-টিমে কেরোসিনের বাতি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ওপারের অন্ধকারকে একটু তরল করিতে পারিয়াছে মাত্র।

সেই তরল অন্ধকারে দুইটি অস্পষ্ট মূর্ত্তি চোখে পড়িল। তাহারা ওধার হইতে পোল পার হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের একটি মূর্ত্তি নারীর।

এই অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে দুইটি নরনারী কি এমন প্রয়োজনে এই বিপদসঙ্কুল সেতুপথ পার হইতে আসিয়াছে, একথা ভাবিয়া সেদিন থমকিয়া দাঁড়াই নাই।

এ দুর্যোগের রাতে এরূপ ব্যাপার যতই কৌতূহলজনক হোক না কেন বিস্ময়কর নয়।

কিন্তু ওপারের তরল অন্ধকারে দুইটি নাতিস্পষ্ট নরনারী-মূর্ত্তির যে আচরণ চোখে পড়িল তাহা সত্যই অসাধারণ।

মেয়েটি আসিতে চায় না। শুধু পোল পার হইবার ভয়ে, না আর কোন গভীরতর আশঙ্কায় জানিনা, সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাণপণে পুরুষটির আকর্ষণ সে যেন প্রতিরোধ করিতে চাহিতেছিল। ঝড়ের শব্দের ভিতর দিয়া তাহাদের যে কয়েকটি কথা শুনিতে পাইতেছিলাম তাহাতে পুরুষটি তাহাকে আশ্বাস দিতে চাহিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

ঝড়ের সহিত যুঝিয়া তখন সেতুর মাঝামাঝি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দেখিলাম, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত রাজী হইয়াছে। পুরুষটি তাহার হাত ধরিয়া ওদিক হইতে পোলের উপর অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরো খানিকটা অগ্রসর হইয়া তাহাদের মুখোমুখি হইলাম। পুরুষ ও মেয়েটি উভয়েই সর্বাঙ্গে তিনপুরু কাপড় মুড়ি দিয়া আছে। কিন্তু সেই কাপড়ের জঙ্গলের ভিতরেই কেরোসিন তেলের বাতির অস্পষ্ট আলোকে মেয়েটির মুখটি চকিতে দেখিয়া আর একবার চমকিয়া উঠিলাম।

শীর্ণ রুগ্ন মুখে, দুইটি দীর্ঘায়ত চোখ—সে চোখে অসহায় আতঙ্কের

যে ছবি প্রত্যক্ষ করিলাম তাহা মানুষের চোখে সম্ভব বলিয়া ভাবি নাই।

কৌতূহল বাড়িয়াই যাইতেছিল। কিন্তু উপায় কি!

পোল প্রায় পার হইয়া আসিয়াছি। এমন সময় পিছনে অমানুষিক চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

সর্বনাশ!

আমার চোখের উপর অসহায় চীৎকার করিয়া মেয়েটি পোলের ধার হইতে টাল সামলাইতে না পারিয়া নিচে পড়িয়া গেল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেখানে ছুটিয়া গেলাম। পুরুষটি বোধ হয় আতঙ্কে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। যে ভাবে সে কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে তাহার নিকট কোন সাহায্য পাইবার আশা নাই বুঝিলাম।

কিন্তু অন্ধকারে এই ঝড়ের ভিতর গভীর নদী হইতে মেয়েটিকে উদ্ধার করিবার জন্য আমিই বা কি করিতে পারি!

এতক্ষণে স্রোতের টানে সে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে কে জানে! সাঁতার জানিলেও এই রাত্রে তাহাকে নদী হইতে উদ্ধার করা এক রকম অসম্ভব।—সাঁতারও জানিনা।

হঠাৎ বহু নিম্ন হইতে অস্পষ্ট কাতর আহ্বান শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরমুহূর্তেই তাহার শাড়ীর প্রান্তটুকু চোখে পড়িল।

পড়িবার সময় তাহার শাড়ীর একটি অংশ কেমন করিয়া লোহার একটি বল্টুতে আটকাইয়া গিয়াছে—মেয়েটি জলে পড়ে নাই। কাপড়ের সহিত জড়াইয়া নিম্নমুখ হইয়া অন্ধকার নদীর উপর ঝুলিতেছে।

ঠেলা দিয়া অপরিচিত লোকটির আচ্ছন্নভাব দূর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম,—শীগ্‌গির এসে ধরুন, এখনও হয়ত টেনে তুলতে

পারি।' লোকটি যন্ত্র-চালিতের মত আসিয়া আমার আদেশ পালন করিল।

মেয়েটি সেদিন নিশ্চিত মৃত্যু হইতে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইয়াছিল। কৃতজ্ঞতা বিনিময়ের তখন সময় ছিল না, পরিচয় জিজ্ঞাসারও নয়—নইলে অনেক কথাই হয়ত শুনিতে পারিতাম।

সাবধানে তাহাদের পার করিয়া দিয়া আবার সেই পোলের উপর দিয়া সভয়ে পার হইবার সময় যে কয়টি কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম তাহাই আমার মনে চিরন্তন সন্দেহ ও বিস্ময় জাগাইয়া রাখিয়াছে।

মেয়েটি পুরুষের সহিত চলিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল—'কি আশ্চর্য দেখ, পড়ে যাবার সময় আমার যেন মনে হল, তুমি আমায় ঠেলে দিলে। পা হড়কে ত পড়িনি, আমার যেন ঠিক মনে হল তুমি ঠেলে দিলে…'

তাহাদের কথা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। লোকটির হাসি শুনিতে পাইলাম। সে যেন বলিতেছিল…

'পাগল! কি যে বল; আমি ঠেলে দেব তোমায়…'

সে ঘটনাটি ভুলিতে পারি নাই। সময়ে অসময়ে সেই বিপদসঙ্কুল সেতুর উপর অস্পষ্টভাবে দেখা মূর্তি দুইটি সম্বন্ধে নানা সন্দেহ, নানা প্রশ্ন মনে জাগে। তাহারা সেই ঝড়ের রাত্রে কেন কোথা হইতে সে পোল পার হইতে আসিয়াছিল, মেয়েটি কেমন করিয়া পড়িয়া গিয়াছিল, রক্ষা পাইয়া অমন কথাই বা সে বলিল কেন এবং তাহার পর তাহারা কোথায় যে গেল তাহার কিছুই জানি না। তবু তাহাদের সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে নানা কথা মন রচনা করে।

সেই অসাধারণ ঘটনা ও সেই অস্পষ্টভাবে দেখা দুইটি মূর্তিকে

কেন্দ্র করিয়া একটি কাহিনী মনের ভিতর আপনা হইতেই গড়িয়া ওঠে।



প্রকাণ্ড সাত মহলা দালান।

কিন্তু এখন আর তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। চারিধারে শুধু ভাঙ্গা নোণাধরা ইট-কাঠের স্তূপ। বাহির হইতে দেখিলে ভুতুড়ে পোড়ো বলিয়া মনে হয়। এই জরাজীর্ণ বাড়ীটির কোনো গোপন কক্ষে এখনো তাহার মুমূর্ষু প্রাণ ধুকধুক করিতেছে, একথা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দিনের বেলায় সে প্রাণের কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

দেউড়ির সিংদরজা ভেদ করিয়া যে বিপুল অশ্বত্থ গাছ শাখায় প্রশাখায় বিপুল হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পত্রচ্ছায়ায় বসিয়া ঘুঘু ডাকে। কাঠবেড়ালীর দল নির্ভয়ে ভূতপূর্ব বারবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়া পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফেরে।

এই ধ্বংসাবশেষের অন্তরালে কোথায় মানুষের জীবনের ধারা বহিয়া চলিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ নয়।

রাত্রে কিন্তু বহু দূর হইতে দেখা যায় ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে কোথা হইতে ক্ষীণ আলোকের রেখা আসিতেছে। এ বাড়ীর ইতিহাস যাহাদের জানা নেই, বিদেশী সে সব পথিক ভয়ও যে পায় না এমন নয়।

গাঁটছাড়া বাঁধা হইয়া এই ধ্বংসাবশেষের পাশে একদিন লাবণ্য পাল্কী হইতে নামিয়াছিল।

বাপের বাড়ী হইতে যে ঝি সঙ্গে আসিয়াছিল সে ত মাটিতে পা দিয়াই ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিল—'কেমনতর বেআক্কিলে বেহারা

গা! এই ভূতুড়ে বাড়ীটার সামনে নামালে—বরকনের অকল্যাণ হবে না!'

যে পুরোহিত বরপক্ষের হইয়া বিবাহ দিতে গিয়াছিলেন পথে তাঁহার সহিত পরিচারিকার কয়েকবার বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দিক দিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিলেও, সম্বোধনের দূরত্বটা ঘুচিয়া গিয়াছিল।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া জবাব দিলেন, 'মর মাগি, ভূতুড়ে বাড়ী হ'তে যাবে কেন? নিয়োগীদের সাতপুরুষের কোটা—এ তল্লাটে জানে না এমন লোক নেই। ওর কাছে হ'ল ভূতুড়ে বাড়ী!'

ঝি কপালে চোখ তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছিল—'ওমা, এরা বলে কি গো! এই পোড়ো বাড়ীতে মানুষ থাকে!' তাহার পর কন্যার পিতার উদ্দেশ্যেই বোধহয় কঠোর মন্তব্য করিয়া বলিয়াছিল,—'মিন্‌সে পয়সা খরচের ভয়ে করলে কি গো! মেয়েটাকে সাপে কামড়ে মেরে ফেলতে এই জঙ্গলে পাঠালে!'

অবগুণ্ঠিত লাবণ্য তখন স্বামীর সহিত গাঁটছড়া বাঁধা হইয়া পাল্কী হইতে নামিয়াছে।

পুরোহিত ঝি-এর সহিত বাক্যব্যয় নিষ্ফল মনে করিয়াই বোধ হয় পথ দেখাইয়া আগে চলিতে শুরু করিয়াছেন।

পথ দেখানটা কথার কথা নয়, একান্ত প্রয়োজন। ভাঙ্গা ইট-কাঠের স্তূপের উপর দিয়া, হাঁটুভর জঙ্গলের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গের মত অন্ধকার বহুদিনের সঞ্চিত শেওলার ভ্যাপসা গন্ধভারাক্রান্ত পথ দিয়া পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে লাবণ্য তাহার স্বামীর পিছু পিছু চলিতেছিল। পিছনে ঝি বাধ্য হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিতে করিতে আপন মনেই গজ্‌ গজ্‌ করিতেছিল—'সাত জন্মে এমন বিয়ের কথা কোথাও শুনিনি মা! বিয়ে করতে এল, তার বরযাত্তর নেই,

ঘরকত্তা নেই। ট্যাং ট্যাং করে এক মরিপোড়া পুরুত এল বরকে নিয়ে; আর খোঁজ নিলে না, শুধুলে না, মেয়েটাকে হাত-পা বেঁধে ধরে দিলে গা! আর এরা কোথাকার আখখুটে গো! জাত্‌গোত্তর নেই, পাড়াপড়শী নেই, বিয়ে করে এল তা বরকনেকে বরণ করতে এল না কেউ! শ্যাল-কুকুরের বিয়েতেও যে এর চেয়ে নেমকানুন আছে...'

লাবণ্য এত কথা শুনিতে বোধহয় পায় নাই। আচ্ছন্নের মত ভীত অসহায়ভাবে চলিতে চলিতে শুধু তাহার মনে হইতেছিল, কেহ যদি শুধু হাতটা বাড়াইয়া একবারটি তাহাকে ধরে তাহা হইলে সে বাঁচিয়া যায়।

কিন্তু হাত কেহ বাড়াইল না।

গজ্‌ গজ্‌ করিতে করিতে এক সময়ে ঝি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—'বলি, ও মুখপোড়া বামুন, কোন্ চুলোয় নিয়ে চলেছ শুনি?'

ব্রাহ্মণ এইবার উত্তর দিলেন,—'তোকে গোর দিতে রে মাগী!'

উত্তরে ঝি যাহা বলিতে শুরু করিল, তাহাতে আর যাহাই হউক, লাবণ্যের প্রথম স্বামীগৃহে পদার্পণের পুণ্যক্ষণ মধুর হইয়া উঠিল না।

ঝি-এর আস্ফালন কতক্ষণ চলিত বলা যায় না। সহসা অন্ধকার পথ কাহার সুমধুর কলহাস্যে মুখরিত হইয়া উঠিল।

ঝি চমকিয়া চুপ করিল। লাবণ্য ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া এই সুমধুর হাস্যের উৎস ঠাওর করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল।

যে হাসিয়াছিল তাহারই কণ্ঠ শোনা গেল—দাদা যে চুপি চুপি বৌ এনে ফেলেছে গো!

তাহার পর শঙ্খধ্বনি।

অন্ধকার পথ তখন শেষ হইয়াছে। সামনেই নাতিবৃহৎ অঙ্গন এবং সেই অঙ্গনের চারিধার ঘিরিয়া ঘরের সারি।

আলোতে আসিয়া দাঁড়াইতেই শাঁখ বাজান থামাইয়া যে মেয়েটি আসিয়া লাবণ্যের মুখের ঘোমটা সরাইয়া আর একবার মধুর হাস্যে সমস্ত বাড়ী মুখর করিয়া তুলিল, তাহার মুখের দিকে একটি নিমেষের জন্য চাহিয়া চোখ নামাইলেও লাবণ্যের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

এত রূপ নারীর দেহে সম্ভব, লাবণ্যের কখনও জানিবার সুযোগ হয় নাই।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল,—'ওমা কেমন বৌ গো, প্রণাম করে না কেন! প্রণাম করতে জান না?'

কাহাকে প্রণাম করিতে হইবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লাবণ্য হেঁট হইয়া মেয়েটিকেই প্রণাম করিতে যাইতেছিল। মেয়েটি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সরিয়া গিয়া বলিল—'আমাকে নয় গো, আমাকে নয়। পিসিমাকে দেখতে পাচ্ছ না?'

লাবণ্য দেখিল। দেখিয়া বুঝি অজ্ঞাতে একটু শিহরিয়া উঠিল।

শকুনের মত শীর্ণ বীভৎস মুখের কাণা একটি চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দিয়া জরার মূর্তি যেন তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।

লাবণ্যের সংসার শুরু হইল।

ঝি দুই দিন থাকিবার পর ভুতুড়ে বাড়ী সম্বন্ধে নানারূপ অসংলগ্ন মন্তব্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিটি মাত্র প্রাণী এই বিশাল ভগ্ন প্রাসাদের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তিনটি ঘরে বাস করে। উপরে নীচে চারিধারে শুধু আগাছার জঙ্গল ও অব্যবহার্য পরিত্যক্ত ঘরের সারি। তাহার কোনটার কড়িকাঠ ঝুলিয়া ছাদ পড়-পড় হইয়াছে, কোনটার দেয়াল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। মাকড়শা, চামচিকে ও ইঁদুর তাহাদের সবগুলিকেই দখল করিয়া আছে।

পোড়ো বাড়ীর ঘরগুলির মত বাড়ীর বাসিন্দাগুলিও রহস্যময়। পিসিমা বলিয়া প্রথম দিন যাঁহাকে প্রণাম করিতে হইয়াছিল, তাঁহার দেখাই বড় মিলে না। অন্ধকার একটি কোণের ঘরে সারাদিন তিনি খুট্‌খাট্ করিয়া কি যে করেন কিছুই জানিবার উপায় নাই। সে-ঘরে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতে যে তিনি চাহেন না, একথা বুঝিতে লাবণ্যের বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। দৈবাৎ কখনও সামনা-সামনি পড়িয়া গিয়া চোখোচোখি হইয়া গেলে তিনি এমনভাবে তাহার দিকে তাকান যে, অকারণে লাবণ্যের বুকের ভিতর পর্যন্ত হিম হইয়া যায়।

স্বামীকেও সে বুঝিতে পারে না। সারাদিন কাজ-কর্ম লইয়া এক রকম সে ভুলিয়া থাকে। রাত্রে কিন্তু শয়ন-ঘরে ঢুকিতে তাহার কেমন যেন ভয় করে।

ঘরটি প্রকাণ্ড। কড়িকাঠ যেখানে দুর্বল, সেখানে বাঁশের ঠেকো দিয়া তাহাকে জোর দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া বড় অদ্ভুত দেখায়। দুইধারে দুইটি জানালা। একটি খুলিলে সম্মুখের প্রকাণ্ড বাঁশবাগান ও পুকুর চোখে পড়ে। আরেকটি বন্ধই থাকে। একদিন খুলিতে গিয়া ভয়ে আর লাবণ্য সে চেষ্টা করে নাই। সে জানালার পাশেই অব্যবহার্য একটি অন্ধকার ঘর ভাঙা কাঠ-কাঠরা জঞ্জালে বোঝাই হইয়া আছে। জানালা খুলিবামাত্র কিসের ঝটপট একটা শব্দ শুনিয়া সভয়ে আবার লাবণ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। হয়ত চামচিকাই হইবে, কিন্তু লাবণ্যের ভয় যায় নাই।

লাবণ্য ঘরে ঢুকিয়া দেখে স্বামী আগে হইতেই বিছানায় বসিয়া আছে। তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সংকুচিতভাবে সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে, তাহার পর ধীরে ধীরে হয়ত গিয়া বিছানার এক পাশে বসে। স্বামী তবুও ফিরিয়া চাহে না; নিজের চিন্তাতেই তন্ময় হইয়া থাকে।

তাহার পর হঠাৎ এক সময়ে স্বামী তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আদরে চুম্বনে একেবারে অভিভূত করিয়া দেয়। স্বামীর কঠিন বাহু-বন্ধনের ভিতর নিশ্চিন্ত আরামে আত্মসমর্পণ করিতে গিয়া কিন্তু লাবণ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না—তাহার মনের কোথায় যেন একটি বাধা থাকিয়া যায়।

সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইয়া বাম বাহু দিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া স্বামী জিজ্ঞাসা করে—'তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে না ত' লাবণ্য?'

লাবণ্য ঘাড় নাড়িয়া জানায়—না কষ্ট তাহার হইতেছে না।

'আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে ত?'

অত্যন্ত সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর প্রশ্নোত্তর! সলজ্জ ভাবে 'হুঁ' বলিয়া লাবণ্য স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া ফেলে।

কিন্তু এই সাধারণ কথাবার্তা হঠাৎ অসাধারণ রূপ গ্রহণ করে। স্বামী সজোরে তাহার মুখটা তুলিয়া ধরিয়া হঠাৎ উগ্রকণ্ঠে বলে—

'অত্যন্ত সহজে হুঁ বলে ফেললে, কেমন? পছন্দ হওয়াটা তোমাদের কাছে এমনি সহজ ব্যাপার!'

লাবণ্য কিছু বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকে। স্বামীর গলা আরো চড়িয়া যায়—

উত্তেজিতভাবে বলিতে থাকে,—'একবার জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিলেই পছন্দ হয়ে গেল! এই ত পছন্দের দাম? কেমন, না?'

লাবণ্য চুপ করিয়া থাকে।

স্বামী বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া ক্ষিপ্তের মত জিজ্ঞাসা করে—'বল, বল, চুপ করে আছ কেন? উত্তর দিতে পার না?'

ভীতভাবে লাবণ্য বলে—'কি বলব?'

'কি বলব? জান না কি বলবে? পুরুষকে এত সহজে কি করে পছন্দ করে ফেল তা বলতে পারবে না?'

একথার উত্তরে কি বলিতে হইবে কিছু বুঝিতে না পারিয়া লাবণ্য চুপ করিয়া থাকে। স্বামী অশান্তভাবে ঘরের ভিতর পায়চারি করিয়া বেড়ায়। কিন্তু স্বামীর উত্তেজনা যেমন বেগে আসে তেমনি তাড়াতাড়ি শান্ত হইয়া যায়।

শান্তভাবে আবার তাহার কাছে আসিয়া বসিয়া বলে—'রাগ করলে লাবণ্য ?'

লাবণ্য ধরা গলায় বলে, 'না, তুমি অমন করছিলে কেন ?'

'ও কিছু নয়, তোমায় একটু ঠাট্টা করলাম। তুমি আমায় সারা-জীবন সত্যি ভালবাসবে ত ?—বাসবে ?'

লাবণ্যের মুখে হাসি দেখা দেয়। আরেকবার স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে অর্ধস্ফুট স্বরে বলে, 'তুমি বুঝি বাসবে না ?'

কিন্তু স্বামীর ঠাট্টার সমাপ্তি ওইখানেই নয়। অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া হয়ত লাবণ্য দেখে—ঘরের দেওয়ালে টাঙান বাতিটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে এবং স্বামী বিছানায় উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন।

সে দৃষ্টিতে অনুরাগের কোমলতা নাই,—সে দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ণ।

লাবণ্য চোখ খুলিয়া চাহিতেই স্বামী যেন অপ্রস্তুত হইয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়া সরিয়া বসে।

লাবণ্য জিজ্ঞাসা করে,—'অমন করে উঠে বসেছিলে কেন গো ?'

'নাঃ কিছু না—তুমি ঘুমের মধ্যে কি যেন বলছিলে তাই শুনছিলাম।'

'কি বলছিলাম ?'

'না, না, বলনি কিছু। যদি কিছু বল তাই শুনছিলুম।' বলিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিয়া স্বামী তাহার উঠিয়া পড়ে।

আর একদিন ভোরের বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া লাবণ্য অবাক হইয়া গেল। ঘরের ভিতর তখনও অন্ধকার। দেওয়ালের আলো তেলের অভাবে বোধহয় নিভিয়া গিয়াছে। কিন্তু সকাল হইতেও আর দেরি নাই। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বাঁশবাগানের মাথায় আকাশের রঙ ঈষৎ লাল হইয়া উঠিতেছে দেখা যায়। বিছানা হইতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ বাধা পাইয়া লাবণ্য দেখিল, তাহার অঞ্চলপ্রান্ত নিজের কাপড়ের খুঁটের সহিত স্বামী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে। স্বামীর এই রসিকতায় মনে মনে হাসিয়া ধীরে ধীরে সে গেরো খুলিয়া লইতেছিল এমন সময়ে কাপড়ে সামান্য টান লাগায় স্বামী জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া সে এমন কাণ্ড করিয়া বসিবে একথা লাবণ্য কল্পনাও করিতে পারে নাই। সবলে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া স্বামী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কোথায়? কোথায় যাচ্ছ, এত রাত্রে? কোথায়?'

স্বামীর ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নাই মনে করিয়া লাবণ্য হাসিয়া বলিল,—'স্বপ্ন দেখছ নাকি! আমি গো আমি; হাত ছাড়, লাগছে।'

স্বামী কিন্তু উচ্চতর কণ্ঠে বলিল—'হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি, তুমি, তোমায় চিনি! কোথায় যাচ্ছ বল শীগ্‌গির; নইলে খুন করে ফেলব!'

এবার লাবণ্য একটু বিরক্তই হইল—বলিল, 'খুন করবার আগে ভাল করে একটু চোখ দু'টো রগড়ে দেখ! ভোর হয়েছে, উঠতে হবে না?'

পূর্বের জানালা দিয়া আকাশের রক্ত আভা তখন ঘরের ভিতর পর্যন্ত ঈষৎ রাঙাইয়া দিয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া স্বামী খানিক চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া

হাসিয়া বলিল—'চোর বলে আরেকটু হলে তোমায় খুন করতে যাচ্ছিলুম আর কি। ভারী বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলুম।'

হয়ত কথাটা সত্য। কিন্তু লাবণ্যের মনে কেমন একটি সন্দেহ জাগিতে থাকে। কাপড়ে গিট দেওয়ার রসিকতাটা কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে।

স্বামীকে সে বুঝিতে পারে না বটে কিন্তু এ বাড়ীর সুন্দরী মেয়েটিকে তাহার আরো দুর্জ্জেয় বলিয়া মনে হয়। বয়সে সে তাহার চেয়ে কিছু বড়ই হইবে—নাম মাধুরী। সে যে এ বাড়ীর কে, এই পরিবারটির সহিত তাহার সম্বন্ধ যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাহার স্বামীকে সে দাদা বলিয়া সম্বোধন করে—সুতরাং ভগিনীস্থানীয়া কেহ হইবে। কিন্তু আপনার ভগিনী যে নয়, এ বিষয়ে শুধু চেহারা দেখিয়া নয়, তাহার আচরণ দেখিয়াও নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

মাধুরীর বিবাহ হইয়াছে কিনা বলা অসম্ভব। সে চওড়াপাড় শাড়ী পরে, সর্বাঙ্গে তাহার বহুমূল্য অলঙ্কার সারাক্ষণ ঝলমল করে, পায়ে আলতা পরিয়া বিম্বফলের মত অধর দু'টি তাম্বুলে রঞ্জিত করিয়া সারাদিন সে পটের ছবিটি সাজিয়া থাকে। অথচ তাহার মাথায় সিঁদুর নাই, এবং বিবাহের বয়স অনেকদিন পার হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

তাহার গতিবিধিও রহস্যময়। সারাদিন সে যে কোথায় থাকে কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। হঠাৎ কখন কোথা হইতে আসিয়া লাবণ্যের গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া হয়ত বলে—'তোকে বড্ড ভালবেসে ফেলেছি ভাই; চ, তোকে নিয়ে কোথাও পালাই।'

অর্থ-হীন অসংলগ্ন কথা; তবু লাবণ্যকে হাসিয়া জবাব দিতে হয় —'কোথায় পালাব?'

'কেন দিল্লী, লাহোর। তুই সাজবি বর, আমি হব তোর কনে। তুই মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবি আর ছোট-বড় চুল ছেঁটে পাঞ্জাবি চড়িয়ে উড়ুনি উড়িয়ে বেরুবি আর আমি তোর পাশে ঘোমটা দিয়ে থাকব। রোজগার করে খাওয়াতে পারবি ত?'

লাবণ্য বলে,—'কেন তুমিই বর হও না!'

'দুর, তাহলে মানাবে কেন? আমার এ-রূপ কি কোঁচা চাদরে ঢাকা যাবেরে হতভাগী।' বলিয়া হাসিয়া আবার মাধুরী উধাও হইয়া যায় এবং খানিকক্ষণ বাদেই হয়ত আবার ফিরিয়া আসিয়া রন্ধনরতা লাবণ্যের ব্যঞ্জনের কড়ায় এক খামচা নুন টপ্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলে,—'বাপের বাড়ী খালি গিলতে শিখেছিলি বুঝি? রাঁধতেও শিখিস নি ছাই!'

লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া বলে—'ও কি করলে ঠাকুরঝি! নুন যে দিয়েছি একবার!'

'বেশ ত, খেতে গিয়ে দাদার মুখপুড়ে যাবে, আর তুই গাল খাবি।' বলিয়া মাধুরী হাসিতে থাকে। সে হাসি দেখিলে সব অপরাধ, সব অন্যায় মার্জনা করা যায়।

কড়াটা নামাইয়া ফেলিয়া লাবণ্য হাসিয়া বলে, 'তুমি ভারী দুষ্টু।'

'আর তুই লক্ষীর প্যাঁচাটি!' বলিয়া রাগ দেখাইয়া মাধুরী চলিয়া যায়। লাবণ্য হাসিতে থাকে।

মাধুরীর হালচালই এমনি। লাবণ্য তাহাকে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে নাই। এই ভয়ঙ্কর বাড়ীটির ভিতর লাবণ্যের শঙ্কিত সন্ত্রস্ত মন শুধু এই মেয়েটির কাছে আসিয়াই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। প্রথম দিন হইতেই তাহার অদ্ভুত আচরণের পরিচয় সে পাইয়াছে। তবু মুগ্ধ হইয়াছে।

ফুলশয্যার রাত্রে আয়োজন অনুষ্ঠান কিছুই তাহাদের হয় নাই। বাপের বাড়ীর ঝি তখন উপস্থিত। ইহাদের কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে নানা কঠোর মন্তব্য উচ্চ-স্বরে অনেকক্ষণ ধরিয়া করিয়াও কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে ঝি নিজেই তাহাকে সারা বিকাল সাজাইয়া গোছাইয়া শয়ন ঘরে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল।

নির্জন ঘর। জড়সড় হইয়া একা সে ঘরে বসিয়া থাকার জন্য লজ্জা ও ভয়ের তাহার আর সীমা ছিল না। মাধুরী সকালে একবার তাহাকে দেখা দিয়াই সেই যে অন্তর্ধান হইয়াছিল, সারাদিন আর তাহার দেখা মিলে নাই। স্বামীও কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন। কখন ফিরিবেন কে জানে? কত রাত তাহাকে এমনি নিঃসঙ্গ ভাবে নির্জন ঘরে কাটাইতে হইবে, ঝি-এর কাছে পুনর্বার ফিরিয়া যাওয়া উচিত কি না—ভাবিতে ভাবিতে লাবণ্য হঠাৎ চোখে হাত চাপা পড়ায় চমকিয়া উঠিল। প্রথমে মনে হইয়াছিল, স্বামীই বুঝি আসিয়াছেন কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারিল এমন কোমল অঙ্গুলী পুরুষের হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে হাসি শুনিয়া তাহার সন্দেহ সহজেই দূর হইয়া গেল।

মাধুরী খিলখিল করিয়া হাসিয়া তাহার চোখ ছাড়িয়া দিয়া সামনে আসিয়া হাত মুখ নাড়িয়া চোখের অপরূপ ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'মেয়ের কি আস্পর্ধা, উনি ভেবেছেন ওঁর বর বুঝি এসে চোখ টিপেছে! বরের দায় পড়েছে!'

পরিচয় তখনও গভীর হয় নাই, তবু লাবণ্য না বলিয়া থাকিতে পারে নাই—'যাঃ আমি বুঝি তাই ভেবেছি!'

'তবে কি ভেবেছ শুনি? ও পাড়ার বেন্দা বোষ্টম এসে চোখ টিপেছে!'

'যাঃ' বলিয়া চোখ তুলিয়া মাধুরীর দিকে চাহিয়াই লাবণ্য একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল।

সর্বাঙ্গ পুষ্পাভরণে অলঙ্কৃত করিয়া মাধুরী সাক্ষাৎ বনদেবীর মতই সাজিয়া আসিয়াছে। সে-রূপ দেখিয়া চোখ ফেরান দুষ্কর। এত ফুলই বা সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল কে জানে?

'অমন করে অবাক হয়ে দেখছিস্ কি বল দেখি?'—বলিয়া লাবণ্যের পাশে বসিয়া পড়িয়া মাধুরী আবার বলিল, 'এখন বল দেখি, তোর ফুলশয্যা না আমার?'

অদ্ভুত কথা। তবু লাবণ্য হাসিয়া বলিয়াছিল—'তোমারই ত দেখছি!'

'শেষ পর্যন্ত দেখতে পারবি ত?' বলিয়া সহসা কলহাস্যে সমস্ত ঘর মুখরিত করিয়া মাধুরী জোর করিয়া লাবণ্যকে ঠেলিতে ঠেলিতে আবার বলিয়াছিল—'তবে বেরো দেখি ঘর থেকে। দেখি তোর বুকের জোর!'

লাবণ্য হাসিতেছিল। ঠেলা দিতে দিতে সত্য সত্যই তাহাকে দরজার কাছ পর্যন্ত সরাইয়া লইয়া গিয়া হঠাৎ মাধুরী থামিয়া বলিয়াছিল,—'এই যে মহিদা'! আর বুঝি তর সইল না? এই নাও বাপু, তোমার বউ এখনও পর্যন্ত আস্তই আছে! আরেকটু হলেই ঠেলে ঘরের বার করে দিয়েছিলাম আর কি?'

মহিম দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। মুখ তাহার অত্যন্ত গম্ভীর। মাধুরীর রসিকতা তাহাকে স্পর্শই করে নাই যেন।

স্বামীর সামনে পড়িয়া গিয়া লাবণ্য একেবারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। মাধুরী তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া একেবারে বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—'নে, তাড়াতাড়ি দখল কর ভাই; আমি যাই। মানুষের মন ত, মতিভ্রম হতে কতক্ষণ।'

মহিমের দিকে হাসিয়া একবার চাহিয়া মাধুরী বাহির হইয়া গিয়াছিল কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ফিরিয়া আসিয়া দরজা হইতে একটা

পুঁটুলি ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—'তোমার বৌ-এর ফুলের গয়না নাও মহিদা, তাড়াতাড়িতে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম।'

মহিম গম্ভীর মুখে পুঁটুলিটি তুলিয়া লইয়া বিছানার উপর নামাইয়া খুলিয়া ফেলিতেই কিন্তু দেখা গিয়াছিল তাড়াতাড়ি খুলিবার দরুন বা পুঁটুলি করিয়া বাঁধিবার জন্য যে কারণেই হোক ফুলগুলি সমস্তই চটকান।

মাধুরীর সব আচরণের অর্থ বোঝা যাক্ বা না যাক্, লাবণ্য সেই দিনই তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল।

রহস্যপুরীর মাঝখানে এমনি করিয়া দ্বিধায় দ্বন্দ্বে ভয়ে আনন্দে লাবণ্যের দিন এক রকম কাটিয়া যাইতেছিল। বিমাতা শাসিত বাপের বাড়ীতে সুখের সহিত পরিচয় তাহার বড় বেশী হয় নাই, সুতরাং এখানকার দুঃখে অভাবে বড় বেশী বিচলিত হইবার তাহার কথা নয়। এ বাড়ীর রহস্য এবং ভীতিও ক্রমশঃ তাহার গা-সওয়া হইয়া আসিতেছিল। বাপের বাড়ী হইতে কালে-ভদ্রে কেহ খোঁজ লইতে আসে—সেখানে যাইবার কিন্তু তাহার আর উপায় নাই সে বোঝে। বুঝি তাহার ইচ্ছাও নাই। এখানেও কোন রকমে জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া দিবার সাহস ও সহিষ্ণুতা সে অনেকটা সঞ্চয় করিয়াও ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়—

সকাল বেলা। দূরে কোথায় যাইতে হইবে, তাই তাড়াতাড়ি সেদিন মহিম খাওয়া সারিয়া লইয়াছে। পান দিবার জন্য লাবণ্য ঘরে ঢুকিয়াছিল। মহিম তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, —'আমি আজ যদি না আসতে পারি, তোমার একলা রাত্রে শুতে ভয় করবে না ত লাবণ্য?

ভয় তাহার করে—করিবেই, কিন্তু স্বামীকে সে কথা বলিয়া উদ্বিগ্ন করা উচিত হইবে কিনা বুঝিতে না পারিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

মহিম আবার জিজ্ঞাসা করিল—'কিগো, বল না, ভয় করবে ?'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া লাবণ্য বলিল—'না, ভয় আর কি ?'

'না, ভয় আর কি ? ভয় তোমার হবে কেন ? একলা শুতেই তুমি চাও, একলাই ভালবাস, কেমন ?'

সে স্বরে ব্যঙ্গের আভাস পাইয়া বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া লাবণ্য দেখিল, স্বামীর মুখ অস্বাভাবিক রকম কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর অদ্ভুত আচরণের সহিত তাহার এতদিনে ভালো করিয়াই পরিচয় হইয়াছে। একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, 'ভয় প্পাবনা বললেও দোষ হয় নাকি ? জানি না বাপু!'

'না, দোষ আর কি'—বলিয়া মহিম সে কথা চাপা দিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাকে ডাকিয়া বলিল,—'যাবার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখিয়ে যেতে চাই! দেখবে ?'

'কি জিনিস ?'

'এস আমার সঙ্গে।'

স্বামীর এই ছেলেমানুষিতে সায় দিবে কিনা লাবণ্য বিচার করিতেছিল কিন্তু মহিম তাহাকে সে অবসর দিল না। হাত ধরিয়া এক প্রকার জোর করিয়া টানিয়াই তাহাকে যেখানে আনিয়া দাঁড় করাইল, সেটি পরিত্যক্ত একদিকের মহলের পুরাতন অব্যবহার্য একটি ঘর।

মরচেপড়া তালা খুলিয়া লাবণ্যকে ভিতরে ঢুকাইয়া তাহার হাতে একটি দেশলাই দিয়া মহিম বলিল, 'আচ্ছা, এই দেশলাইটা জ্বাল দেখি।'

লাবণ্য দেশলাই জ্বালাইতেছিল। হঠাৎ পিছনে দরজা বন্ধের শব্দ

শুনিয়া সবিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিল, স্বামী বাহিরে গিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়াছেন। শুধু তাই নয়, দরজায় শিকলি তোলার শব্দও পাওয়া গেল।

এ আবার কি রকম ঠাট্টা! লাবণ্য বলিল, 'ওকি করছ? ভাঁড়ার এলো রেখে এসেছি। এখন আমার রঙ্গ করবার সময় নেই! খোলো তাড়াতাড়ি!'

কিন্তু দরজার ওদিক হইতে কোনো সাড়া-শব্দ শোনা গেল না।

লাবণ্য আবার বলিল—'এখন কি ছেলেমানুষির সময়! তোমার এঁটো থালা-বাটি সব পড়ে আছে; পিসিমা, ঠাকুরঝি কেউ খায়নি—খোল!'

কিন্তু তথাপি কেহ উত্তর দিল না। এবার লাবণ্যের ভয় হইল। অন্ধকার ঘরের ভিতর কিছুই দেখা যায় না—শুধু এখানে ওখানে নানাপ্রকার শব্দ হইতে থাকে। লাবণ্য দরজায় সবেগে করাঘাত করিয়া নব-বধূর পক্ষে অশোভন উচ্চ কাতরকণ্ঠে ডাকিল,—'ওগো কেন এমন করছ? খুলে দাও, আমার ভয় করছে।'

কোথাও কাহারও সাড়া-শব্দ নাই। স্বামীকে সে একটু চিনিতে শিখিয়াছে—মনে হইল যদি সে দরজায় তালা দিয়া একেবারে চলিয়াই গিয়া থাকে। যদি এ ক্ষণিকের পরিহাস না হয়?

ভাবিতেই ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। এখান হইতে চীৎকার করিয়া গলা চিরিয়া ফেলিলেও কেহ যে শুনিতে পাইবে না একথা সে ভাল করিয়াই বোঝে। এই অন্ধকার নির্জন পরিত্যক্ত ঘরে তাহাকে সারা দিন রাত্রি কতক্ষণ যে কাটাইতে হইবে কে জানে! আশঙ্কায় উদ্বেগে কাঁদিয়া ফেলিয়া আর একবার স্বামীকে মিনতি করিয়া কাতর-স্বরে সে বলিল—'ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, খুলে দাও, কেন আমায় এমন কষ্ট দিচ্ছ?'

সে মিনতি কেহ শুনিল না। শুনিবার কেহ ছিল বলিয়াও মনে হয় না।



কতক্ষণ এইভাবে যে তাহার কাটিয়াছে সে জানে না। ভয়ের চরম অবস্থা পার হইয়া অবসাদে তাহার সমস্ত দেহমন তখন প্রায় নিস্পন্দ হইয়া আসিয়াছে। লাবণ্যের মনে হইল, কে যেন দরজার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া সে ডাকিল,—'কে?'

বাহিরের পদশব্দ থামিল।

লাবণ্য অস্ফুট কণ্ঠে আর একবার বলিল, 'আমায় খুলে দাও না গো!'

পর মুহূর্তেই সুমধুর হাস্যধ্বনি শোনা গেল, 'ওমা, তুই এখানে!'

তাহার পর শিকলি খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া মাধুরী বলিল, 'আর আমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি যে তুই পালিয়ে গেছিস্! দেখ দেখি তোর অন্যায়! এমন করে মানুষকে হতাশ করে?'

তাহার কথায় বুঝি মড়ার মুখেও হাসি ফোটে। ম্লান হাসিয়া লাবণ্য বলিল, 'যমের বাড়ী ছাড়া পালাব কোথায় ঠাকুরঝি!'

যেন সাগ্রহে তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মাধুরী বলিল,—'দূর, যমের বাড়ী যাবি কেন? পৃথিবীতে আর জায়গা নেই। পালাবি বল, সব বন্দোবস্ত করে দিই তা'হলে। বাড়ীর মাছিটি পর্যন্ত টের পাবে না।'

তাহার কথার ধরনে এত দুঃখেও লাবণ্যের মুখে আবার হাসি দেখা দিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—'কিন্তু ও কেন অমন করে ঠাকুরঝি, বলতে পার? কি আমার অপরাধ?'

'তোর অপরাধ নয়? মরতে কেন এ বাড়ীতে তুই এসে জুটেছিস্? পালাতে বললাম, তা কথাটা যেন গায়েই মাখ্‌লি না—তোর অপরাধ নয়?' কিন্তু খানিকবাদেই গম্ভীর হইয়া বলিল, 'এ বাড়ীর এমন দশা কেন জানিস্?'

লাবণ্য তাহার গলার স্বরে বিস্মিত হইয়া উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?' মাধুরীর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, —'মেয়েমানুষের শাপে; হাজার হাজার মেয়েমানুষের শাপে এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ঘরের ভিতর পর্যন্ত ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে। সাতপুরুষ ধরে এরা মেয়েমানুষের এমন অপমান লাঞ্ছনা নেই, যা করেনি। তাদের সে অভিশাপ যাবে কোথায়! যা নিয়ে একদিন ছিনিমিনি খেলেছে, তারই জন্য দুর্ভাবনা আজ তোর বরের বুক কুরে কুরে খাচ্ছে! ও যে সেই বংশের শেষ বাতি!'

কথা কহিতে কহিতে তাহারা তখন অঙ্গনের আলোকে নামিয়া আসিয়াছে। সে আলোয় মাধুরীর মুখের চেহারা দেখিয়া লাবণ্যের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। অকারণে অমানুষিক রাগে ও ঘৃণায় তাহার সে পরম সুন্দর মুখ বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

মাধুরীর সব কথা ভাল করিয়া লাবণ্য সেদিন বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু তাহার মনের কোণে একটি অহৈতুক আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সে আতঙ্ক স্বামীর আচরণে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। স্বামীকে এখন প্রায়ই দূরে যাইতে হয়। ছুতা করিয়া নয়, সোজাসুজি সবলেই মহিম তাহাকে ঘরের ভিতর পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিয়া যায়। স্বামী চলিয়া যাইবার পর মাধুরী আসিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেয়, এইটুকুই যা সান্ত্বনা। আবার স্বামী আসিবার পূর্বে মাধুরী তাহাকে ঘরের ভিতর পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখে।

কিন্তু একদিন এ কৌশল ফাঁক হইয়া গেল। মহিম তাহাকে বন্দী করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। মাধুরী আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, 'মজা দেখ্‌বি ত আয়—'

'কি মজা?'

'পিসিমার ঘরে কি আছে দেখ্‌বি? পিসিমা আজ ভুলে ঘরে তালা না দিয়েই কোথায় বেরিয়েছে।'

সভয়ে লাবণ্য বলিল, 'না না, দরকার নেই, পিসিমা এসে পড়বে।'

কিন্তু মাধুরী ছাড়িবার পাত্রী নয়, বলিল, 'এলেই বা; মেরে ত আর ফেলতে পারবে না দু-দু'টো জোয়ান মেয়েকে।'

লাবণ্য তবুও আপত্তি করিতেছিল, মাধুরী তাহাকে একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। পিসিমা ঠিক তালা দিতে ভোলেন নাই তবে দৈবাৎ চাবি ঠিক লাগে নাই, তালা আলগাই আছে। মাধুরী দরজা খুলিয়া লাবণ্যকে টানিয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘর অন্ধকার। সে অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ার পর দেখা গেল, সঙ্কীর্ণ ঘরে কোথাও আর স্থান নাই, ছোট বড় বাক্স পেঁটরা, সিন্দুক, বাসন-কোসন কাপড়-চোপড়ে ছাদ পর্যন্ত বোঝাই হইয়া আছে।

লাবণ্য ভয়ে ভয়ে বলিল, 'দেখা ত হ'ল, চল এবার যাই।'

মাধুরী বলিল, 'দূর এখনও কিছুই দেখিস্‌ নি।' তাহার পর ঝট্‌ করিয়া একটা বাক্সের ডালা খুলিয়া সে প্রথমেই যে জিনিসটি বাহির করিয়া আনিল, অন্ধকারেও তাহার স্বরূপ বুঝিয়া লাবণ্য চমকাইয়া উঠিল।—সেকালের জড়োয়া গহনা!

লাবণ্যের মনে হইল অন্ধকারে তাহার মূল্যবান পাথরগুলি হিংস্র সরিস্থপের চোখের মতই যেন তাহার দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিয়া

আছে। লাবণ্যের বুকের ভিতরটা অকারণ ভয়ে শুকাইয়া আসিতেছিল। বলিল 'চল, চল ঠাকুরঝি, আমার ভাল লাগছে না।'

'তুই ত আচ্ছা ভয়কাতুরে!' মাধুরী সশব্দে সমস্ত বাক্সটা মেঝের উপর উজাড় করিয়া ফেলিয়া বলিল—'নে বেছে নে? বুড়ীর ঘরে এমন জিনিস জমা হ'য়ে থেকে কোন লাভ আছে কি?'

লাবণ্য তবু সভয়ে আপত্তি জানাইল,—'না না ঠাকুরঝি চল!'

কিন্তু মাধুরীর চোখ দুইটাও তখন কিসের উন্মত্ততায় জ্বলিতেছে। বাক্সের পর বাক্স, পাত্রের পর পাত্র সে মেঝের উপর উপুড় করিয়া ফেলিতেছিল। কঠিন স্বরে বলিল, 'না, দেখি আগে সব।'

গহনা, টাকা, মোহর, মণিরত্ন—এই প্রাচীন লুপ্তপ্রায় পরিবারের সমস্ত সম্পদ বৃদ্ধা বুঝি তাহার ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সম্পদ আগলাইয়া ডাইনীর মত সে দিবারাত্রি বসিয়া থাকে—অন্ধকারে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে প্রাণহীন প্রস্তরের অস্বাভাবিক জ্যোতির প্রখরতা তাহার চোখেও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সহসা লাবণ্য 'মাগো' বলিয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। মাধুরী চোখ তুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা দরজায় দাঁড়াইয়া হিংস্র শ্বাপদের মত তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য,—পরক্ষণেই শোনা গেল বৃদ্ধা সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর কলহাস্যে ঘর মুখরিত হইয়া উঠিল। লাবণ্য কাতর কণ্ঠে বলিল, 'কি হবে ঠাকুরঝি!'

'হবে কি আবার, গহনা পরি আয়—!' বলিয়া মাধুরী এক ছড়া মুক্তার হার লাবণ্যের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

সারাদিন তাহারা বন্দী থাকিবার পর সন্ধ্যায় মহিম পিসিমার

সহিত আসিয়া দরজা খুলিল। ইতিমধ্যে কি তাহাদের কথাবার্তা হইয়াছিল বলা যায় না কিন্তু মহিম এ ব্যাপারের উল্লেখ পর্যন্ত করিল না। এক-গা গহনা পরিয়া পিসিমার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হানিয়া, মহিমের দিকে ফিরিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া মাধুরী বাহির হইয়া গেল। পিসিমা বা মহিম তাহাকে কেহ কোন বাধা পর্যন্ত দিল না।

নীরবে রাত্রি কাটিল। সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত কোন কথাই হইল না। বিকালে হঠাৎ মহিম আসিয়া বলিল, 'চল, যেতে হবে।'

লাবণ্য সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কিছু বুঝিতে পারিল না।

মহিম আবার বলিল, 'ওঠ, যেতে হবে।'

'কোথায় ?'

'জানি না।' মহিম আলনা হইতে একটা চাদর লইয়া তাহার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'আর কিছু নিতে হবে না, ওঠ !'

তাহার গলার স্বরে ভয় পাইয়া লাবণ্য উঠিয়া দাঁড়াইল। কাতর কণ্ঠে একবার শুধু প্রশ্ন করিল, 'কোথায় যাবে ?'

মহিম উত্তর দিল না। তাহার একটি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

আবার সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত পথ, আবার সেই হাঁটুভর জঙ্গল, ইঁট-কাঠের স্তূপ পার হইয়া লাবণ্য স্বামীর সহিত বাহির হইয়া আসিল। পিছনে বাড়ীর আঙ্গিনায় সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া সুন্দরী মাধুরী তাহাদের যাত্রাপথের দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, এইটুকু শুধু সে দেখিয়া আসিয়াছে। এ বাড়ীতে প্রথম

প্রবেশের সময় যে কলহাস্য তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, সেই কলহাস্যই বিদায়ের বেলায় তাহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।

ট্রেণে সারা পথ কোন কথা হয় নাই। শহরে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন রাত্রি হইয়াছে। তাহার উপর দারুণ দুর্যোগ। সারা শহরের উপর ঝড় ও বৃষ্টির উচ্ছৃঙ্খল মাতামাতি চলিয়াছে।

একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যেতে হবে হুজুর?'

'যেখানে খুশি।'

গাড়োয়ান এমন কথা হয়ত আগেও শুনিয়াছে। সে দ্বিরুক্তি না করিয়াই গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

গাড়ী কিছুক্ষণ চলিবার পর মহিম প্রথম কথা বলিল এবং কথা বলিল যেন একেবারে নতুন মানুষ হইয়া।

বলিল, 'তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি লাবণ্য। এতদিনের ব্যবহারে আমায় মনে মনে তুমি ঘৃণা করতে শুরু করেছ কিনা তাও জানি না; কিন্তু একটি কথা বুঝে আজ আমায় ক্ষমা করতে অনুরোধ করছি লাবণ্য। ও বাড়ীর হাওয়া পর্যন্ত বিষাক্ত—এইটুকু জেনে তুমি আমায় মার্জনা করতে পারবে নাকি কখন?'

অন্ধকারে ডান-হাতটি বাড়াইয়া স্বামীর হাতটি খুঁজিয়া লইয়া লাবণ্য এই স্নেহ-স্বরে অভিভূত হইয়া গিয়া বলিল—'কেন তুমি এসব কথা বলছ, বল দেখি। মনে আমার কিছু থাকলে তোমার সঙ্গে এমন করে আসতে পারতাম কি?'

মহিম গাঢ়স্বরে ডাকিল,—'লাবণ্য।'

লাবণ্য স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া বলিল—'কি?'

'আবার আমরা সহজ মানুষের মত সংসার আরম্ভ করতে পারি না

কি লাবণ্য? সাত পুরুষের পাপ দেহ থেকে ধুয়ে ফেলে আবার নতুন জন্ম পাওয়া যায় নাকি? যেখানে কেউ আমাদের জানে না এমন জায়গায়, একেবারে নতুন করে জীবন আরম্ভ করলে আবার আমি সহজ হতে পারব না কি?'

'কেন পারবে না?'

'তুমি জান না লাবণ্য, কত বাধা, রক্তের ভেতর কত বিষ জমে আছে! কিন্তু এ বিষ থেকে আমি মুক্ত হবই, শুধু যদি তোমার ভালবাসা পাই!'

'তোমায় আমি ভালবাসি না?'

'বাস, বাস জানি, কিন্তু অসুস্থ মনে অকারণ সন্দেহ জাগে। সে সন্দেহে মিছে পুড়ে মরি, তোমাকেও পোড়াই। তুমি শুনে হাসবে লাবণ্য কিন্তু তুমি ও-কথাটি প্রতিদিন আমাকে বলে স্মরণ করিয়ে দিলে আমি যেন জোর পাই।'

গাড়োয়ান ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইয়া এক সময়ে বলিল,—'সারা রাত ধরে ত ঘুরতে পারি না বাবু।'

'আচ্ছা থাক।' বলিয়া সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অপরিচিত স্থানেই মহিম হঠাৎ লাবণ্যের হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িল। গাড়োয়ান ভাড়া বুঝিয়া পাইয়া অবাক হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল সেই জানে।

মহিম বলিল,—'ভয় করছে না ত' লাবণ্য?'

চাদরটা ভাল করিয়া মুড়ি দিয়া স্বামীর বুকের কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া লাবণ্য বলিল,—'না, কিন্তু কোথায় যাবে?'

'চল না যেদিকে খুশি! ঝড়-বৃষ্টি থামলে যেখানে গিয়ে উঠব সেইখানে ভাবব আমাদের নবজন্ম হ'ল।'

লাবণ্য কথা কহিল না। স্বামীর হাত ধরিয়া নীরবে চলিতে শুরু করিল।

উদ্দেশ্যবিহীন চলা। কোন্ সময়ে তাহারা ছোট্ট নদীটির ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে জানিতেও পারে নাই। মহিম বলিল,—'চল, ওই পোল পার হয়ে যাব!'

এবার লাবণ্য একটু ইতস্ততঃ করিল। বলিল—'কিন্তু ও পোল ভাঙ্গা কি না কে জানে, যদি পড়ে যাও।'

'তুমিও আমার সঙ্গে পড়বে। পারবে না পড়তে?'

আবার তাহার চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টি দেখিয়া লাবণ্য চমকিয়া উঠিল।

গাড়ীর নিরাপদ আশ্রয়ে লাবণ্যকে বুকের কাছে ধরিয়া যে স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল, এতখানি পথ হাঁটিতে হাঁটিতে তাহা মহিমের মন হইতে কখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কি বিশ্বাস নারীকে করা যায়? কি তাহার প্রেমের মূল্য? আজ যে ভালবাসিয়াছে, কাল বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার কতক্ষণ! তাহার চেয়ে এই মধুরতম মুহূর্ত্তটিকেই চিরন্তন করিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না কি? এই সন্দেহের দোলা হইতে চিরদিনের মত রক্ষা পাইয়া তাহার ক্লান্ত মন যে তাহা হইলে পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারে! ভালবাসা, জীবনে যদি আপনাকে অপমানই করে তখন তাহাকে মৃত্যুর মধ্যে অমর করিয়া রাখিলে ক্ষতি কি?

লাবণ্যের হাত ধরিয়া দোদুল্যমান সেতুর উপর দিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ মহিম তাহাকে ঠেলিয়া দেয়…

তাহার পরের কথা বলিয়াছি। আমার কাহিনী ঐখানেই আসিয়া থামিয়াছে। পোল পার হইয়া মহিম লাবণ্যকে লইয়া

কোথায় গিয়াছে আমি জানি না। আমার কল্পনার অন্ধকারে তাহারা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

কে জানে, মাধুরী হয়ত সেই জনহীন ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে এখনও প্রেতিনীর মত ঘুরিয়া বেড়ায়। হয়ত আর কোথাও জীবনের সেতু হইতে মহিম লাবণ্যকে কবে ঠেলিয়া দিয়াছে।

সংক্রান্তি

কম্বলের তলা থেকে অখিল সমস্ত শুনতে পাচ্ছিল। নিচে মেসের ঝি তার নিত্য-নিয়মিত কলহ বাধিয়েছে ঠাকুরের সঙ্গে। পাশের 'সীটের' প্রৌঢ় খিটখিটে ভদ্রলোক তাঁর হাঁপানির একঘেয়ে একটানা কাসিতে কান ঝালাপালা করে তুলছেন। তারি ফাঁকে ফাঁকে, পাশের ঘরের ছাত্রের জ্যামিতি মুখস্থ-করার শব্দ, মেসের পেছনে ছাই-গাদায় একপাল কাকের কোলাহল ও নীচে ক্রুদ্ধা ঝি, বাসন-কোসনের ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়ায় তাদের করুণ ধাতব আর্তনাদ এসে পৌঁছাচ্ছিল।

একঘেয়ে কাসির অস্বস্তিকর শব্দে সমস্ত গা নিশপিশ করলেও কম্বল ছেড়ে তার উঠতে ইচ্ছা করছিল না। কালকের অত হাঁটাহাঁটিতে পায়ের সমস্ত শিরা উপশিরায় টান ধরেছে। ছেঁড়া, শতছিদ্র, মোটা-লোমের কম্বলটা মুড়ি দিয়ে সে চুপ ক'রে শুয়েই রইল। খানিক বাদে কাসির বেগ থামলে ভদ্রলোক খেঁকিয়ে ব'লে উঠলেন, "কি, আজ ঘর ঝাঁট দেবার পালা কার মশাই? বেলা আটটা বেজে গেল আপনি যে নবাব—" আবার নতুন করে কাসির বেগ আসায় কথা আর তাঁর শেষ হ'ল না, কিন্তু সেই অসমাপ্ত কথার ঝাঁজটা অখিলের তেতো মনটাকে আরো তেতো করে তুললে। কম্বলের ভেতর থেকেই সে বলে উঠল, "পারব না আমি ঝাঁট দিতে।" তারপর বললে, "আমার জ্বর হয়েছে।"

প্রৌঢ়ের কাসির বেগ তখনও থামেনি। তিনি উত্তর দিতে পারলেন না, কিন্তু কম্বলের ভেতর থেকে তাঁর চোখের দৃষ্টি যদি সে দেখতে পেত তা হলে উত্তরটা বুঝতে তার দেরি হ'ত না।

পুনর্বার কাসির বেগ থামলে ভদ্রলোক তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, "জ্বর ত আপনার রোজই হয়, কিন্তু ভাতের থালায় কারুর চেয়ে কম

উৎসাহ কোন দিন ত দেখলুম না। তাও যদি দু'-দু'মাসের টাকাটা বাকী না থাকত।—আচ্ছা বেহায়া লোক যাহোক।"

এই সত্য অপবাদের কোন উত্তর না দিয়ে অখিল তাড়াতাড়ি কম্বল ফেলে ছেঁড়া গা'র কাপড়টা গায় দিতে দিতেই বিছানা থেকে উঠে বেরিয়ে গেল। অসহ্য এই দুর্মুখ বুড়োর সঙ্গ। কেমন ক'রে সে যে এতদিন বুড়োকে দু'ঘা না দিয়ে সংযত হয়ে আছে সে নিজেই ভেবে পায় না। মানুষের কি দুর্দিন আসে না? মেসের পাওনা সেকি ইচ্ছে করে দেয় না? মানুষের—

রান্নাঘরে ঠাকুরকে গিয়ে বললে, "ঠাকুর একটু ঘুঁটের ছাই দিতে পার?"

ঠাকুর ভাতের প্রকাণ্ড ডেকচি উনোনে চাপাতে চাপাতে বললে, "ঘুঁটের ছাই সব ফেলে দিয়েছি বাবু; এত বেলায় কি আর থাকে!"

অখিল ধমক দিয়ে বললে, "কে তোমায় ফেলে দিতে বলেছিল?"

ঠাকুর তার ধমকে ভ্রূক্ষেপ না করে উনোনে খোঁচা দিতে লাগল। আরো চটে উঠে সে বললে, "তোমার কি কথা কানে যায় না নাকি?"

ঠাকুর উনোনে খোঁচা দিতে দিতেই গম্ভীরস্বরে বললে, "কাজের সময় বকবক করবেন না বাবু। ঘুঁটের ছাই নাই বলছি, মিছে গোলমাল করবেন না।"

অসহ্য এই ছোটলোক ঠাকুরের অহঙ্কার ও স্পর্ধা! সে এবার চীৎকার ক'রে বললে, "বকবক করব না কি? তোমার যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার আস্পর্ধা আমি বার করে দিতে পারি জানো?"

ঠাকুর তথাপি নির্বিকার ভাবে তরকারীর চুবড়ি সরাতে সরাতে বললে, "যাও, যাও! তোমার মত ঢের বাবু দেখেছি।" তারপর সামনে এসে হাত নেড়ে একটু উত্তেজিতস্বরে বললে, "আমি কি তোমার

কেনা গোলাম নাকি? যাও, কি করতে পার করগে' যাও। আমি ভয় করি না।"

মেসের দু'চারজন কলতলায় মুখ ধুচ্ছিল, তারা এসে অখিলকে ধরে বললে, "আরে, কি করেন অখিলবাবু! ওদের সঙ্গে কি ওরকম ব্যবহার করে?"

অখিল তখন নিরুপায় ক্রোধে ফুলছিল; কিছু না বলে ধীরে ধীরে চলে গেল। শুনতে পাচ্ছিল ঠাকুর বলছে, "এরকম করলে আমি এখানে চাকরি করতে পারব না বাবু। ভাল কথায় বললুম—এত বেলা হয়ে গেছে এখন কি আর ঘুঁটের ছাই থাকে?"

কলতলা থেকে মুখচোখে জল দিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অখিল ভাবছিল—এবার যদি বুড়ো আবার খরঝাঁট দেবার কথা বলে, আর আপত্তি করবে না। আর পারা যায় না ঝগড়া করে—না চাইলেও বচসা কোথা থেকে তার কপালে এসে জোটে!

কিন্তু বুড়োকে ঘরে গিয়ে না দেখতে পেয়ে একটু স্বস্তি বোধ হ'ল। তাড়াতাড়ি, বুড়ো আসবার আগেই কাগজপত্রগুলো নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ছাতে বসতে হ'বে। কিন্তু কালকের রাতের আধপোড়া সিগারেটটা কেরোসিন কাঠের টেবিলটার ওপর রেখেছিল; সেটা পাওয়া গেল না। ক্রমাগত খুঁজে খুঁজেও না পাওয়াতে তার বিরক্তি বেড়ে যাচ্ছিল। পৃথিবী সুদ্ধু সবাই তার সঙ্গে বাদ সাধতে চায়। টেবিলের জিনিসপত্র উল্‌টে উল্‌টে কিছুতেই সেটাকে পাওয়া গেল না। ক্রমশঃ তার জেদ ও রাগ বেড়ে চলেছিল। দরকারের সময় একটা আধপোড়া সিগারেটও কি পাওয়া যায় না? না, পাওয়া চাই-ই। বিছানার ভেতর সিগারেট ছিল না; তবু সেটাও উল্‌টে ফেলে দিলে। রাগে তার ইচ্ছা হচ্ছিল, টেবিল চেয়ার সমস্ত ঘরের আসবাব-পত্র গুঁড়িয়ে চুরমার করে ফেলে। তার সাথে কারসাজি ক'রে যেন তারা মজা দেখছে!

বুড়ো কখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, অখিল টের পায় নি। বুড়ো ভদ্রলোক এবার খেঁকশেয়ালের মত গলায় চীৎকার ক'রে সবাইকে ডেকে বললেন, "দেখে যান মশাইরা, অখিলবাবুর কাণ্ডকারখানা দেখে যান্। আপনারা ভাবেন বুঝি খিটখিটে বুড়ো ইচ্ছা ক'রে ঝগড়া বাধায়। আচ্ছা দেখুন ত, এরকম লোকের সঙ্গে কি ক'রে এক ঘরে বাস করা যায়! উনি ত একদিনও ঘর পরিষ্কার করবেন না; কিন্তু এমনি করে সমস্ত ঘর ছন্নভন্ন করলে, আরেকজন থাকে কি করে?" দু'চারজন এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। অখিল কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রাগে টেবিলের ওপরকার ময়লা পুরোন খবরের কাগজগুলো টেনে মাটিতে ফেলতে লাগল। বাইরের একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হয়েছে অখিলবাবু, কিছু হারিয়েছে কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সিগারেটটা।"

আরেকজন বললেন, "আপনার পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে,—ঐটে কি?"

সত্যিই, আধপোড়া সিগারেটটা পায়ের কাছেই পড়েছিল, অখিল সেটা কুড়িয়ে নিলে। একজন বলে উঠলেন, "ঐটুকুর জন্যে এত কাণ্ড!"

একটা হাসির রোল উঠল। কাগজ আর দোয়াত কলম নিয়ে অখিল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। বুড়ো পেছন থেকে বলে উঠলেন, "বলি, জিনিসপত্রগুলো আমাকে রাখতে হ'বে নাকি?"

সত্যিই ত! সে ফিরে এসে কাগজ-পত্র জিনিস ইত্যাদি বিছানার উপর গাদা ক'রে রেখে বেরিয়ে গেল। লোকগুলো হাসছিল।

নিজেকে সমস্ত পৃথিবীর দ্বারা বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জেনে নিজেকে ঘা দেওয়ার একটা তীব্র বেদনাভরা আনন্দ আছে। সে নিজেকে অমনি করে পীড়া দিচ্ছিল। দোতলার ছাদের যে কোণটায় একটা ভাঙ্গা

টুলের ওপর সে বসেছিল সেখান থেকে সমস্ত মেসের দৃষ্টিপথের আড়ালে থাকা যায় ও উত্তরের সমস্ত উন্মুক্ত শহরের দৃশ্য চোখে পড়ে। শীতের দিনে প্রথম রোদের খানিকটা কিরণও সেখানে পড়ে। সামনেই নতুন বাড়ীটা তৈরি শেষ হয়ে গেছে। সকাল বেলা আর মিস্ত্রিদের গোলমালের উপদ্রব নেই। এই নিরিবিলি জায়গাটিতে বসে সে অতীত জীবনের কাঁটাগুলোকে নাড়া দিয়ে নতুন করে পুরাতন বেদনার স্বাদ গ্রহণ করছিল। বড় বড় দুঃখ নয়, খুব গভীর বেদনার কাহিনী নয়, তার মনে আসছিল শুধু জীবনের ছোটখাট, তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর বঞ্চনার, বেদনার, অপমানের, ক্ষোভের স্মৃতি।

সে তখন ছোট; তার মামাত বোনের বিয়ের জন্য বরপক্ষীয়েরা মেয়ে দেখতে এসেছিল। তার মামা মেয়ের গুণ-বর্ণনা করবার সময় একটু বাড়িয়ে বলছিলেন, "কাজে কর্মে দেখে নেবেন, মেয়ে আমার কি রকম দুরন্ত। মেয়েরা শুধু বিবি সেজে বই মুখে ক'রে বসে থাকবে, সে আমি মোটেই দেখতে পারি না। বাড়ীর অর্ধেক রান্না ত ও একলাই করে—"

হঠাৎ মামার কথার মাঝে সে বলে উঠেছিল, "বাঃ বাণীদি ত একদিনও রাঁধে না।"

এইটুকু ছেলের এই অস্বস্তিকর সত্যবাদিতার স্পর্ধায় ঘরসুদ্ধ লোক, এমন কি বরপক্ষীয়েরাও এমন ক'রে তার দিকে চেয়েছিল যে, সে দৃষ্টি ছুঁচের মত তার মর্মে বিঁধে চিরকালের মত দাগ দিয়ে গেছে।

এমনি আরও অনেক কথা তার মনে পড়ছিল। তার এই বাইশ বছরের জীবনে কত দুঃখই না সে পেয়েছে। কত লাঞ্ছনা, কত অবিচারের কোন প্রতিকার না-করতে পেরেই না নিষ্ফল অভিমানে আজ সে সংসারের ওপর বীতরাগ হয়ে উঠেছে।

সামনের নতুন বাড়ীটাতে কথাবার্তার শব্দ শুনে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। তাহলে এর মধ্যেই নতুন বাড়ীতে ভাড়াটে এসেছে! একটি স্থূলকায়া বর্ষীয়সী মহিলা সামনের উঠোন দিয়ে চলে গেলেন। তার কিছুক্ষণ বাদেই মৃদু চুড়ির আওয়াজে চমকিত হয়ে সে চেয়ে দেখলে, একটি কিশোরী সুন্দরী মেয়ে উঠোনের কোণ থেকে তার দিকে চেয়ে আছে। তার মনে হ'ল অপরূপ সুন্দর ওই মেয়েটির দাঁড়াবার ভঙ্গীটি! তার মনের রাত্রির অসহ্য গুমোটের মাঝে ওই মেয়েটির সকৌতুক দৃষ্টিটি যেন স্নিগ্ধ এক পশলা বৃষ্টির আশীর্বাদের মত এলো···বর্ষীয়সী মহিলাটি আবার উঠোনটি পার হয়ে গেলেন। যেতে যেতে একবার তার দিকে চাওয়াতে সে একটু লজ্জিত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে। মেয়েটিও খানিক বাদে চলে গেল! এতক্ষণ বাদে কাগজ-কলম তুলে নিয়ে সে লিখলে,—"আজ একটি ছোট্ট মেয়ের চাউনি পেয়েছি। আমায় অনেক দুঃখ দিলে দেবতা, অনেক লাঞ্ছনা, অনেক বঞ্চনার বেদনা; কিন্তু এইটুকুর জন্যে আজ তোমায় প্রণাম করছি। একটি কিশোরীর সকৌতুক চাহনি,—তার ভেতর বিপুল কোন ইঙ্গিত নেই, কোন আশাতীত আশ্বাস নেই, তবু এই চাহনিটুকুর জন্যে তোমায় প্রণাম দেবতা! কত চাহনিই এ জীবনে দেখলুম,—ঘৃণার বিষে ক্রূর, অবজ্ঞার আঘাতে কঠিন, লালসার উগ্রতায় ফেনিল, আর আজ জীবনের মরুপথে এই একটি স্নিগ্ধ অসংকোচ নিষ্পাপ চাহনি। তুমি সংসারে বীভৎস ব্যাধি দিয়েছ, মানুষের হৃদয়ে নির্মমতা দিয়েছ, পৃথিবী-জোড়া হাহাকার দিয়েছ, কিন্তু কিশোরীর চোখে এই অসীম রহস্যও দিয়েছ, আর আমায় সে রহস্যের আনন্দ উপলব্ধি করবার ক্ষমতা দিয়েছ—তোমায় বারবার নমস্কার দেবতা!"

লেখা শেষ করে অখিল ভাবলে, না হতাশ হ'লে চলবে না, আবার নতুন উৎসাহে কাজের খোঁজ করতে হবে। জীবনে অনেককিছু

করবার আছে। কিন্তু মেয়েটিকে আর একবার দেখবার ইচ্ছে হচ্ছিল। সে সেইখানে দাঁড়িয়ে গুনগুন ক'রে গান গাইতে লাগল।

হঠাৎ যেন বজ্রাহত হয়ে সে চুপ ক'রে গেল। বর্ষীয়সী মহিলাটি উঠোনে নেমে তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে বলছিলেন, "কোথাকার ছোটলোকরে! ভদ্দরলোকের বাড়ীর মেয়েছেলের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা, গান গাওয়া,—কি এসব! ডাক্ ত ওঁকে, এখুনি একবার গিয়ে ভদ্দর-লোকের বাড়ীর ছেলেমেয়ের দিকে নজর দেওয়া বার করে আসুক। এতদিন ত ওপাড়ায় ছিলুম, এমন ছোটলোক ত কখন দেখিনি গা!—ডাক্ না পটল।"

শেষটা আর সে শুনতে পারলে না। লজ্জায়, ঘৃণায়, ভয়ে তার পা কাঁপছিল। মেসে দারিদ্র্য ও নানা কারণে তার যথেষ্ট সুনাম আছে, তার ওপর ভদ্রলোক এসে এই কথা জানালে যে কি ব্যাপার ঘটবে তা কল্পনা ক'রে তার হৃদয়ের স্পন্দন যেন থেমে যাচ্ছিল। ভদ্রলোক আসবার আগেই একটা কিছু করা দরকার। কম্পিত হাতে খাতা-পত্র তুলে নিয়ে দ্রুতপদে নিজের ঘরে ঢুকে সেগুলো রেখে সে ছেঁড়া চটিটা পায়ে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে নেমে বেরিয়ে গেল।

মেস্ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর যেতেই পেছন থেকে কে ডাকলে, "বাবু।"

চমকে সে ফিরে দেখলে তাদের পাড়ার বুড়ো দর্জি। অনেকদিন আগে তার কাছ থেকে একটা পাঞ্জাবি করিয়ে নিয়েছিল; মজুরী এখনো দেওয়া হয় নি।

"এখনো পাইনি, পেলেই দিয়ে দেব।" বলে সে এগিয়ে চলল।

পেছন থেকে ডেকে দর্জি বললে, "পালান কেন বাবু? দেব দেব ত বলছেন আজ ছ'মাস—দশ আনা পয়সার জন্যে আর কতদিন

তাগাদা করা যায়? স্পষ্টই বলে দিন না, দিতে পারব না; পালাবার দরকার কি?"

"সত্যি পেলেই দেব"—বলে সে এগিয়ে গেল।

পেছন থেকে দর্জির উচ্চস্বর শোনা গেল—"আচ্ছা এইবার রাস্তায় ধরলে জামা কেড়ে নেব।"

অভুক্ত ক্লান্ত দেহে বিকেল পর্যন্ত সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। এর পরে সে মেসে কি ক'রে মুখ দেখাবে ভেবে পাচ্ছিল না। এতক্ষণে সেখানে কি জানাজানি, কি কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে, তার নামে কত কুৎসা রটনা হয়েছে ভেবে তার চোখ দিয়ে জল আসছিল, যদি বা সে মুখ দেখাতে সাহস করে তবু মেসের মেয়াদ তার আজ থেকে যে ফুরোলো, এ একেবারে নিশ্চিত। একে তার ছ'মাসের টাকা বাকী, তার ওপর এই ঘটনা। সেখানে তার আর জায়গা নেই। কোন্‌খানেই বা আছে সে ভেবে পেল না। কিন্তু ভগবান জানেন সে নির্দোষ। কাল রাত থেকে অনাহারে থাকায় ও সমস্ত দিনের বেড়ানর পরিশ্রমে তার ভয়ানক ক্ষিদে পাচ্ছিল। কিন্তু একটু বিশ্রামের জায়গা যাকে কেউ দিতে রাজী নয় তার ক্ষুধার আবেদনে কে কান দেবে? আর সে চাইবে কোন্ লজ্জায়? এক বন্ধুর কাছে বহুদিন আগে কুড়ি টাকা ধার করেছিল। আজ ঘুরতে ঘুরতে তার সামনে গিয়ে পড়েছিল। ইচ্ছা ছিল একটা মিথ্যা ওজর দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবে, কিন্তু বন্ধুই নীরব অবজ্ঞায় তাকে উপেক্ষা করে সামনে দিয়ে চলে গেল। মিথ্যা ওজর সে অনেকবার শুনেছে। বন্ধু চলে গেলে মনে হয়েছিল, তাকে আজকের দুঃখ জানিয়ে একটা টাকা চাইলে সে কি দিত না? বড়লোকের ছেলের একটা টাকায় কি আসে যায়?

কিন্তু আজ না হয় সে বাঁচল, তারপর কাল, তারপর পরশু, তারপর বাকী জীবন কি এমনি করেই কাটাতে হবে? কিসের আশায়?

দেশ থেকে মা চিঠি দিয়েছেন, "তোমার ভগ্নীপতি মারা গেছেন, লীলার ভয়ানক অসুখ, চলে এসো।"

কাল আবার চলতে ফিরতে পাওনাদারদের তাগাদা আরম্ভ হবে। মাথা রাখবার ঠাঁই খোঁজবার চেষ্টায় হয়রান হয়ে ফিরতে হবে। আর যদিও না মেস থেকে তাড়িয়ে দেয় মেসের লোকের টিটকারি, গালিগালাজ, ঐ হাঁপানি রোগীর দাঁতখিঁচুনি শুনতে হবে দিনের পর দিন। এই যে ছেঁড়া চটিটার ভিতরে একটা পেরেক উঠে পা ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে এইটেই পায় দিয়ে চাকরির সন্ধানে ফিরতে হবে, সভয়ে পাওনাদারদের চোখ এড়িয়ে। মার কাতর চিঠি আসবে বারে বারে। সত্য বিধবা বোনের মিনতি আসবে। কিন্তু কেন আর? সংসার ত তাকে বারবার অপমান করে জানিয়ে দিলে সে অনাবশ্যক, একেবারে অনাবশ্যক পৃথিবীর ভার। তবু সে কোন্ আশায় আর এ ঘৃণ্য জীবনের মেয়াদ বাড়াতে চায়?

পার্কের চেয়ার থেকে উঠে সে আবার চলল। খানিকদূর গিয়ে চটি দু'টো পা থেকে খুলে ফেলে দিলে। পা দিয়ে রক্ত পড়ছিল। যে বন্ধু তার সঙ্গে অবজ্ঞায় রাস্তায় কথাও কয় নি তার কাছেই চলল আবার।

বন্ধুর বাড়ির দরজায় গিয়ে যখন সে দাঁড়াল তখন সে মনে মনে একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করেছে। অনেক ডাকাডাকি ও মেজাজী চাকর-বাকরকে বিস্তর সাধাসাধির পর বন্ধুর দেখা মিলল। বন্ধু ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করলে, "কি মনে করে? টাকা-কড়ির কিছু সুবিধে হ'ল এতদিনে।"

বন্ধু আরাম কেদারায় বসল, কিন্তু তাকে বসতে কোন রকম ইঙ্গিতও করলে না।

"আমি অন্য দরকারে এসেছি।"

বন্ধু হাই তুলে আলস্য ভেঙে বললে, "দেড় বছর প্রায় হল না? আর নিয়েছিলে বোধ হয় সাতদিনের কড়ারে মনে হচ্ছে।" তারপর শুষ্ক ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, "এতদিন ত রাস্তায় দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যেতে আর নেহাত সামনে পড়ে গেলে মিছে কথা বলতে আবোল তাবোল। আজ শুভাগমন হবার কারণটা শুনতে পাই?"

"আমায় একটা টাকা যদি দাও ভাই, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নি।"

এই অপ্রত্যাশিত ধৃষ্টতায় বন্ধু অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর চেয়ার থেকে উঠে, পর্দা সরিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললে, "তোমার কি একটু লজ্জা হ'ল না অখিল? ছ্যাঃ—"

কাতরকণ্ঠে উচ্চস্বরে অখিল বললে, "তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আর কখনো আসব না। আজ শুধু একটি টাকা দাও, আমি কাল থেকে সত্যি কিছু খাই নি!"

বন্ধু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "খাও নি যখন তখন এখানে না হয় খাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। টাকা হবে না।"

অখিলের সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল, সে মূঢ়ের মত বললে, "না না আমি মিথ্যে বলছিলুম, আমার খাওয়া হয়েছে ভাই, আমার একটা টাকার বিশেষ দরকার, এই—"

কিন্তু কোন ওজর সে তাড়াতাড়ি খুঁজে পেল না।

বন্ধু তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "বেড়ে লোক ত তুমি, বলি আজকাল নেশা ভাঙ করছ নাকি? মৌতাতের থাঁকতি পড়েছে বুঝি?"

সে শুধু একটু হাসলে। ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে পাঁচটা বাজল।

সত্যিই বন্ধুর পা' দুটো হঠাৎ ধরে ফেলে সে মিনতি করে বললে,

দাঁড়িয়েছে ভাবতেই তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হয়ে এল। আজ সে আফিং পেয়েছে ভালই হয়েছে, নইলে কাল সে কেমন করে সকালে মুখ দেখাত?

মেসের সকলে শীতের দরুন সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। সে ধীরে ধীরে ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দেখলে বুড়োও ঘুমিয়েছে। বুড়োর হারিকেনটা সন্তর্পণে জ্বেলে সে বিছানায় চিঠি লিখতে বসল। টেবিলের ওপর দু'খানা চিঠি তার নামে রয়েছে। কিন্তু কি হবে আর চিঠি পড়ে? চিঠি লিখেও আর কি হবে? যে মরল তার কৈফিয়ত কিসের? পৃথিবীর লোক কি ভাবল-না-ভাবল কি জানল-না-জানল, যে মরে গেল তার তাতে কি আসে যায়? না, কোন কৈফিয়ত সে দেবে না। কিসের কৈফিয়ত? কার কাছে?—

ক্ষুধায় নাড়ীগুলোতে পাক দিচ্ছিল। কালো গুলিটি সে আলোর সামনে তুলে ধরলে। হাত কাঁপছিল। জীবনের কত অতৃপ্ত আশা, অস্ফুট কামনা, অব্যক্ত বেদনা! তার শেষের সঙ্গীরা, তার যৌবনের প্রিয়া, তার দুঃখী মা, তার অসহায় বিধবা বোন, যে কেউ তাকে এক-দিনের জন্যেও ভালবেসেছে বা স্নেহ দিয়েছে, সবাইকে প্রীতি নিবেদন করে যদি সে শান্ত অবিচলিত মনে সংসার থেকে বিদায় নিতে পারত।···কিন্তু একি জ্বালা অন্তরে বাহিরে, একি তীব্র প্রতিহিংসার বিষজর্জরতা, একি বিপুল আক্ষেপ, একি দুর্নিবার ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, যে কেউ আজ সুখে সংসারে নিদ্রা যাচ্ছে সবার ওপর! সে বাঁচতে চায়, প্রাণভরে বাঁচতে চায়, তবু তাকে যেতেই হবে। কি নির্মম কি অযাচিত এই বিদায়! সমস্ত সংসারে সকল সুখীকে যদি সে আজ খুন করে যেতে পারত। কাল তার মৃতদেহের ওপর ওই ঘৃণিত বুড়ো

বন্ধু হাই তুলে আলস্য ভেঙে বললে, "দেড় বছর প্রায় হল না? আর নিয়েছিলে বোধ হয় সাতদিনের কড়ারে মনে হচ্ছে।" তারপর শুষ্ক ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, "এতদিন ত রাস্তায় দেখা হলে পাশ কাটিয়ে যেতে আর নেহাত সামনে পড়ে গেলে মিছে কথা বলতে আবোল তাবোল। আজ শুভাগমন হবার কারণটা শুনতে পাই?"

"আমায় একটা টাকা যদি দাও ভাই, আমি সমস্ত দিন কিছু খাই নি।"

এই অপ্রত্যাশিত ধৃষ্টতায় বন্ধু অবাক্ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর চেয়ার থেকে উঠে, পর্দা সরিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বললে, "তোমার কি একটু লজ্জা হ'ল না অখিল? ছ্যাঃ—"

কাতরকণ্ঠে উচ্চস্বরে অখিল বললে, "তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আর কখনো আসব না। আজ শুধু একটি টাকা দাও, আমি কাল থেকে সত্যি কিছু খাই নি!"

বন্ধু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "খাও নি যখন তখন এখানে না হয় খাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। টাকা হবে না।"

অখিলের সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল, সে মূঢ়ের মত বললে, "না না আমি মিথ্যে বলছিলুম, আমার খাওয়া হয়েছে ভাই, আমার একটা টাকার বিশেষ দরকার, এই—"

কিন্তু কোন ওজর সে তাড়াতাড়ি খুঁজে পেল না।

বন্ধু তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে, "বেড়ে লোক ত তুমি, বলি আজকাল নেশা ভাঙ করছ নাকি? মৌতাতের থাঁকৃতি পড়েছে বুঝি?"

সে শুধু একটু হাসলে। ঘড়িতে ঢং করে সাড়ে পাঁচটা বাজল।

সত্যিই বন্ধুর পা' দুটো হঠাৎ ধরে ফেলে সে মিনতি করে বললে,

দাঁড়িয়েছে ভাবতেই তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শিথিল হয়ে এল। আজ সে আফিং পেয়েছে ভালই হয়েছে, নইলে কাল সে কেমন করে সকালে মুখ দেখাত ?

মেসের সকলে শীতের দরুন সকাল-সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল। সে ধীরে ধীরে ভেজান দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে দেখলে বুড়োও ঘুমিয়েছে। বুড়োর হারিকেনটা সন্তর্পণে জ্বেলে সে বিছানায় চিঠি লিখতে বসল। টেবিলের ওপর দু'খানা চিঠি তার নামে রয়েছে। কিন্তু কি হবে আর চিঠি পড়ে ? চিঠি লিখেও আর কি হবে ? যে মরল তার কৈফিয়ত কিসের ? পৃথিবীর লোক কি ভাবল-না-ভাবল কি জানল-না-জানল, যে মরে গেল তার তাতে কি আসে যায় ? না, কোন কৈফিয়ত সে দেবে না। কিসের কৈফিয়ত ? কার কাছে ?—

ক্ষুধায় নাড়ীগুলোতে পাক দিচ্ছিল। কালো গুলিটি সে আলোর সামনে তুলে ধরলে। হাত কাঁপছিল। জীবনের কত অতৃপ্ত আশা, অস্ফুট কামনা, অব্যক্ত বেদনা ! তার শেষের সঙ্গীরা, তার যৌবনের প্রিয়া, তার দুঃখী মা, তার অসহায় বিধবা বোন, যে কেউ তাকে এক-দিনের জন্যেও ভালবেসেছে বা স্নেহ দিয়েছে, সবাইকে প্রীতি নিবেদন করে যদি সে শান্ত অবিচলিত মনে সংসার থেকে বিদায় নিতে পারত।...কিন্তু একি জ্বালা অন্তরে বাহিরে, একি তীব্র প্রতিহিংসার বিষজর্জরতা, একি বিপুল আক্ষেপ, একি দুর্নিবার ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, যে কেউ আজ সুখে সংসারে নিদ্রা যাচ্ছে সবার ওপর ! সে বাঁচতে চায়, প্রাণভরে বাঁচতে চায়, তবু তাকে যেতেই হবে। কি নির্মম কি অযাচিত এই বিদায় ! সমস্ত সংসারে সকল সুখীকে যদি সে আজ খুন করে যেতে পারত ! কাল তার মৃতদেহের ওপর ওই ঘৃণিত বুড়ো

হাঁপানির কাসি কাসবে, ওকে গলা টিপে মেরে, পৃথিবীর সমস্ত সুখ আনন্দকে গলা টিপে মেরে সে যেতে পারে না কি ?'

আফিংটা গিলে ফেলে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শিয়রে আলোটা জ্বলতে লাগল। অনেকক্ষণ গেল। কতক্ষণ তার আন্দাজ ছিল না। মাথাটা বোধ হয় ঝিমঝিম করছিল। আলোতে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে সে পড়তে চেষ্টা করলে। পয়লা, দোসরা পৌষমাস, পূর্ণিমা, লালকালিতে ছুটির তারিখ সব পড়তে পারলে। আঙ্গুলগুলো একবার মুড়লে। আর খানিকবাদেই হাত পা খিঁচুনি, গোঙানি শুরু হবে। খুব কষ্ট হবে কিনা সে ভাবছিল। কোথায় টাইমপিস্‌টা টিক্‌টিক্ করছিল। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়······না তাড়াতাড়ি আর ত গুণতে পারছে না! সে উঠে বসল। সে ত যাচ্ছেই তার আগে চিঠি দু'টো পড়লে দোষ কি ?

প্রথমটায় মা লিখেছে, "···লীলাকে আর রাখতে পারলুম না, কাল সকালে সব ফুরিয়ে গেছে···চিঠি পেয়েই চলে এস।"

আলোটার উজ্জ্বলতা বোধ হয় ছিল না, পড়তে কষ্ট হচ্ছিল। দ্বিতীয়টা খুললে। হাতের অক্ষর দেখে অবাক হয়ে গেল। অক্ষর-গুলো মনে হচ্ছিল যেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই বোধ হয় শেষের সূচনা। কিন্তু লেখাগুলো যে ভয়ানক চেনা! আলোটা আরো উজ্জ্বল করে দিয়ে বেশ একটু কষ্ট করেই সে চিঠিটা আগ্রহসহকারে পড়লে। সে লিখেছে এতদিনের নীরবতার পর।—

'জানি তোমার কাছে ক্ষমা পাবার আশা করা আমার অনুচিত, তবু এই দুর্দিনে তোমায় ছাড়া কাউকে মনে পড়ল না।···হয় ত তুমি ভুলে গেছ, মনে রাখবার মত কোন কিছু তোমায় কখন দিই নি··· সেদিন যে আঘাত পেয়েছিলে তাও বোধ হয় এতদিনে মুছে গেছে কিন্তু আমি ভুলি নি···মেয়েরা যাকে ভালবাসে তাকে হয় ত ভুলতে

আপাদমস্তক র‍্যাপারে ঢেকে নিস্তব্ধ পথ দিয়ে দু'টি মজুর দ্রুতপদে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলে, "আমায় ধর।"

একজন দাঁড়াল।

আর একজন তার কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে, "আবার দাঁড়ায়, দেখছিস না বেটা মদ খেয়েছে।"

কোন মতে ডাক্তারের বাড়ীর বন্ধ দরজার পাশে গিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল। সমস্ত শহর নিস্তব্ধ, দূরে কোথা থেকে শুধু গোটাকতক নিদ্রাহীন কুকুরের কলহ-কোলাহল তার কানে ক্ষীণভাবে এসে পৌঁছাচ্ছিল।

শিথিল দুর্বল হাতে ডাক্তারের দরজায় ঘা দিয়ে সে কাতরকণ্ঠে ডাকতে চেষ্টা করলে, 'ডাক্তারবাবু!' কণ্ঠ থেকে সে স্বর বাইরে পৌঁছাল না বোধ হয়।…আবার সে আঘাত দিলে, আবার, আবার। কিন্তু সে আঘাত ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল। তার হাতের মুঠোয় তখন ছবির চিঠিটি ধরা।

হাঁপানির কাসি কাসবে, ওকে গলা টিপে মেরে, পৃথিবীর সমস্ত সুখ আনন্দকে গলা টিপে মেরে সে যেতে পারে না কি ?'

আফিংটা গিলে ফেলে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। শিয়রে আলোটা জ্বলতে লাগল। অনেকক্ষণ গেল। কতক্ষণ তার আন্দাজ ছিল না। মাথাটা বোধ হয় ঝিমঝিম করছিল। আলোতে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটার দিকে চেয়ে সে পড়তে চেষ্টা করলে। পয়লা, দোসরা পৌষমাস, পূর্ণিমা, লালকালিতে ছুটির তারিখ সব পড়তে পারলে। আঙ্গুলগুলো একবার মুড়লে। আর খানিকবাদেই হাত পা খিঁচুনি, গোঙানি শুরু হবে। খুব কষ্ট হবে কিনা সে ভাবছিল। কোথায় টাইমপিস্‌টা টিক্‌টিক্ করছিল। এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়……না তাড়াতাড়ি আর ত গুণতে পারছে না! সে উঠে বসল। সে ত যাচ্ছেই তার আগে চিঠি দু'টো পড়লে দোষ কি ?

প্রথমটায় মা লিখেছে, "…লীলাকে আর রাখতে পারলুম না, কাল সকালে সব ফুরিয়ে গেছে…চিঠি পেয়েই চলে এস।"

আলোটার উজ্জ্বলতা বোধ হয় ছিল না, পড়তে কষ্ট হচ্ছিল। দ্বিতীয়টা খুললে। হাতের অক্ষর দেখে অবাক হয়ে গেল। অক্ষর-গুলো মনে হচ্ছিল যেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। এই বোধ হয় শেষের সূচনা। কিন্তু লেখাগুলো যে ভয়ানক চেনা! আলোটা আরো উজ্জ্বল করে দিয়ে বেশ একটু কষ্ট করেই সে চিঠিটা আগ্রহসহকারে পড়লে। সে লিখেছে এতদিনের নীরবতার পর !—

'জানি তোমার কাছে ক্ষমা পাবার আশা করা আমার অনুচিত, তবু এই দুর্দিনে তোমায় ছাড়া কাউকে মনে পড়ল না।…হয় ত তুমি ভুলে গেছ, মনে রাখবার মত কোন কিছু তোমায় কখন দিই নি… সেদিন যে আঘাত পেয়েছিলে তাও বোধ হয় এতদিনে মুছে গেছে কিন্তু আমি ভুলি নি…মেয়েরা যাকে ভালবাসে তাকে হয় ত ভুলতে

আপাদমস্তক র‍্যাপারে ঢেকে নিস্তব্ধ পথ দিয়ে দু'টি মজুর দ্রুতপদে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলে, "আমায় ধর।"

একজন দাঁড়াল।

আর একজন তার কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে, "আবার দাঁড়ায়, দেখছিস না বেটা মদ খেয়েছে।"

কোন মতে ডাক্তারের বাড়ীর বন্ধ দরজার পাশে গিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল। সমস্ত শহর নিস্তব্ধ, দূরে কোথা থেকে শুধু গোটাকতক নিদ্রাহীন কুকুরের কলহ-কোলাহল তার কানে ক্ষীণভাবে এসে পৌঁছাচ্ছিল।

শিথিল দুর্বল হাতে ডাক্তারের দরজায় ঘা দিয়ে সে কাতরকণ্ঠে ডাকতে চেষ্টা করলে, 'ডাক্তারবাবু!' কণ্ঠ থেকে সে স্বর বাইরে পৌঁছাল না বোধ হয়।...আবার সে আঘাত দিলে, আবার, আবার। কিন্তু সে আঘাত ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল। তার হাতের মুঠোয় তখন ছবির চিঠিটি ধরা।

শকুন্তলা

বাংলায় একটা জাতি আছে যার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন নৃতত্ত্ববিদ্ কোন গবেষণা করেন নি।

দৈর্ঘ্যপ্রস্থে তারা অর্থনীতিবিদ্ ভাগ্য-দেবতার মিতব্যয়িতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাদের ছেলে-মেয়েরা দেরি করা ভালবাসে না। তারা হুড়মুড় করে পৃথিবীতে আসে, তারপর যথাসময়ের যথেষ্ট আগে নিঃশেষে যৌবনের নিমেষের পেয়ালা খালি করে চটপট করে বুড়ো হয়ে সংসারের কাজ সমাপ্ত করে সরে পড়ে চক্ষু মুদে।

ছেলেরা বিশ না পেরুতে বাচ্চাকাচ্ছার বাপ হয় আর ত্রিশ না পেরুতে চুল পাকিয়ে চল্লিশের আগেই বৈতরণীর কড়ির যোগাড় দেখে। মেয়েরা বারো যেতেই মাতৃত্বের কোঠা ডিঙিয়ে এসে আঠারো না যেতে যৌবনের পালা ঘুচিয়ে স্বামীর সহধর্মিণী হয়।

সে জাতি আর কেউ নয়—আমরা—বাংলার কলমের ক্রীতদাস কেরানী।

তারা জাতিতে ছিল কেরানী। তারা সাতপুরুষে কলম ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার ধরেনি। তাদের সাতপুরুষের শৈশব পুষ্ট হয়েছে মায়ের স্তনের অপ্রচুর পাতলা দুধে আর জল-বার্লিতে। কেরানী জাতের তারা বনিয়াদী বংশ।

অষ্টম পুরুষে তাদের কিন্তু বংশপরম্পরাসেবিত কলমের মর্যাদা রাখতে কোন পুরুষ অবতীর্ণ হল না। হল শুধু একটি মেয়ে। মেয়ের মা মাঝে মাঝে সময় হলে পাড়ার লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে পড়তেন। তাঁর বড় সাধ ছিল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে যদি হয়

তারপরে 'স্নিগ্ধ সজল মেঘ-কজ্জল দিবসে' বিংশ শতাব্দীর শকুন্তলা স্বামীর উত্তরীয়ে অঞ্চল বেঁধে চক্ষুভরা অশ্রু এবং বক্ষভরা উদ্বেগ নিয়ে স্বামীর পেছু পেছু গাড়িতে উঠে তার চির-পরিচিত গলিপথ দিয়ে প্রথম স্বামীর ঘর করতে চলে গেল।

···সেখানে হয়তো সে একদিন নিপুণা কেরানী গৃহিণী হয়ে উঠবে এবং পুত্রপৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হয়ে সুখে দুখে সংসার করবে···

কিন্তু কেরানী-দুহিতা বিংশ শতাব্দীর শকুন্তলার জীবনে মহাকাব্যের কোনো উপকরণ কি নেই? তা নিয়ে কোন অমর নাটিকা রচনা করবার মতো কবি আজো হয়নি? কোনো অভিজ্ঞান সে হারাবে না, তার বিরহ-ব্যাকুল দীর্ঘনিশ্বাস যুগান্তরের নরনারীকে বিচলিত করে তুলবে না? সে শকুন্তলা কিন্তু শুধুই বুঝি নামে, কেরানী গৃহিণীর পক্ষে অশোভন একটা অকিঞ্চিৎকর নামে।

শকুন্তলা

বাংলায় একটা জাতি আছে যার সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন নৃতত্ত্ববিদ্ কোন গবেষণা করেন নি।

দৈর্ঘ্যপ্রস্থে তারা অর্থনীতিবিদ্ ভাগ্য-দেবতার মিতব্যয়িতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাদের ছেলে-মেয়েরা দেরি করা ভালবাসে না। তারা হুড়মুড় করে পৃথিবীতে আসে, তারপর যথাসময়ের যথেষ্ট আগে নিঃশেষে যৌবনের নিমেষের পেয়ালা খালি করে চটপট করে বুড়ো হয়ে সংসারের কাজ সমাপ্ত করে সরে পড়ে চক্ষু মুদে।

ছেলেরা বিশ না পেরুতে বাচ্চাকাচ্ছার বাপ হয় আর ত্রিশ না পেরুতে চুল পাকিয়ে চল্লিশের আগেই বৈতরণীর কড়ির যোগাড় দেখে। মেয়েরা বারো যেতেই মাতৃত্বের কোঠা ডিঙিয়ে এসে আঠারো না যেতে যৌবনের পালা ঘুচিয়ে স্বামীর সহধর্মিণী হয়।

সে জাতি আর কেউ নয়—আমরা—বাংলার কলমের ক্রীতদাস. কেরানী।

তারা জাতিতে ছিল কেরানী। তারা সাতপুরুষে কলম ছাড়া অন্য কোন হাতিয়ার ধরেনি। তাদের সাতপুরুষের শৈশব পুষ্ট হয়েছে মায়ের স্তনের অপ্রচুর পাতলা দুধে আর জল-বার্লিতে। কেরানী জাতের তারা বনিয়াদী বংশ।

অষ্টম পুরুষে তাদের কিন্তু বংশপরম্পরাসেবিত কলমের মর্যাদা রাখতে কোন পুরুষ অবতীর্ণ হল না। হল শুধু একটি মেয়ে। মেয়ের মা মাঝে মাঝে সময় হলে পাড়ার লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে পড়তেন। তাঁর বড় সাধ ছিল একটি ছেলে আর একটি মেয়ে যদি হয়

তারপরে 'স্নিগ্ধ সজল মেঘ-কজ্জল দিবসে' বিংশ শতাব্দীর শকুন্তলা স্বামীর উত্তরীয়ে অঞ্চল বেঁধে চক্ষুভরা অশ্রু এবং বক্ষভরা উদ্বেগ নিয়ে স্বামীর পেছু পেছু গাড়িতে উঠে তার চির-পরিচিত গলিপথ দিয়ে প্রথম স্বামীর ঘর করতে চলে গেল।

···সেখানে হয়তো সে একদিন নিপুণা কেরানী গৃহিণী হয়ে উঠবে এবং পুত্রপৌত্রাদি পরিবেষ্টিত হয়ে সুখে দুখে সংসার করবে···

কিন্তু কেরানী-দুহিতা বিংশ শতাব্দীর শকুন্তলার জীবনে মহাকাব্যের কোনো উপকরণ কি নেই? তা নিয়ে কোন অমর নাটিকা রচনা করবার মতো কবি আজো হয়নি? কোনো অভিজ্ঞান সে হারাবে না, তার বিরহ-ব্যাকুল দীর্ঘনিশ্বাস যুগান্তরের নরনারীকে বিচলিত করে তুলবে না? সে শকুন্তলা কিন্তু শুধুই বুঝি নামে, কেরানী গৃহিণীর পক্ষে অশোভন একটা অকিঞ্চিৎকর নামে।

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে

ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, "ভরসন্ধ্যেয় দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন ? খোল্ না, কতক্ষণ দাঁড়াব !"

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক, সিল্কের একটা শাড়ী সেলাই করছিল। স্ত্রীলোকটির ঠিক বয়স আন্দাজ করা কঠিন হলেও শিল্কের শাড়ীটি যে সমস্ত উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য খুইয়ে বীভৎস প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছে এটা সহজেই বোঝা যায়।

দরজায় প্রথম আঘাত শুনে বেগুন কিসের আশায় একটু চঞ্চল হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ীটি বিছানার তলায় লুকোবার চেষ্টা করতে গেছ্‌ল কিন্তু তারপর বাড়ীউলির গলার স্বর শুনে সেটি আর না লুকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে, "খোলাই আছে, জোরে ধাক্কা দাও।" তারপর আবার সে সেলাইএ মন দিলে।

তার হারান-যৌবনের সমস্ত সম্পদের মধ্যে ঐ কণ্ঠস্বরটুকু বুঝি এখনো অবশিষ্ট ছিল। কণ্ঠস্বরটি ছেঁড়া জুতোর নতুন ফিতার মত একেবারে বেখাপ্পা !

বাড়উলী তার বিপুল বাতগ্রস্ত দেহ নিয়ে অতি কষ্টে এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে বেঁকে আর একপা তুলে উঁচু চৌকাঠটা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে বললে,—"সে ছোঁড়া ত আজও এল না রে বেগুন—সে এবার ভেগেছে।"

বেগুন কোন কথা না বলে নীরবে শাড়ীটা সেলাই করতে লাগল।

বাড়ীউলী তক্তপোশ কাঁপিয়ে বসে বললে, "বলছিলুম কি, এই বেলা তোর তাগা জোড়াটা বিক্রি করে ফেল্; শশীর বাবু ত শশীকে

একথা শশী ছাড়া আর কারুর মুখ থেকে বেরুলে মাসী সহ্য করত না। কিন্তু শশীর এখন রাজপাট ; সুতরাং অতিকষ্টে কথাটা হজম করে মাসী বললে, "বেশ আমি না হয় ধুমসি, তুই না হয় রূপুসী, তা বলে তোর মাসী ত, তুই পারিস বলেই সাধছি নইলে আর কাউকে কি বলতে গেছি ?"

মনস্তত্ত্বে মাসীর অশিক্ষিত পটুত্ব ছিল। রূপসী বলায় ও ক্ষমতার উল্লেখে খুশী হয়ে শশী বললে, "আচ্ছা চ দেখি, বাবু গাড়ি আনতে গেছে।"

ঝগড়া হঠাৎ থেমে যাওয়ায় দরজায় ভিড় হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বেগুন ইতিমধ্যে নীরবে টীনের ভাঙ্গা পেঁটরা থেকে কাপড়-চোপড় বার করায় মন দিয়েছে।

'সায়েবদের মেলায়' যাবার আশায় আপাততঃ রাগটা কিছু ভুলে, মাসী শশীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "খোরাকী আর ভাড়া না পেলে বাছা, বলে যাচ্ছি, কাল থেকে আমার বাড়ীতে আর তোমার জায়গা হবে না।"

"আচ্ছা আজই ভাড়া দেব।" বলে বেগুন দরজাটা সশব্দে ভেজিয়ে দিলে। এখন তাড়াতাড়ি সাজ-পোশাক তার না করলে নয়। আজকের এই একজিবিশনই তার একমাত্র আশা। সত্যই দু'মাস তার ঘরে কেউ আসে নি, দু'মাস ধরে মাসীর কাছে ধারে খাচ্ছে। প্রদীপের তেলটুকুও আজ ক্ষ্যান্তর অনুপস্থিতিতে তার ঘর থেকে না বলে নিয়ে এসেছে। মাসী যে পয়সা না পেলে এতদিনের বাসিন্দা বলে একটুও খাতির রাখবে না একথা সে ভাল রকমই জানে। আজ কোন রকমে শিকার হাতড়ান চাইই। তাই মান্ধাতার আমলের সিল্কের শাড়ীটা এতক্ষণ ধরে সে সেলাই করেছে। আজ একজিবিশনে গেলে, রাত্রের মত খাওয়া বন্ধ জানলেও এখন জলখাবারের জন্যে অপব্যয়

বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে

ঘরের দরজায় ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীউলীর কর্কশ গলা শোনা গেল, "ভরসন্ধ্যেয় দরজা বন্ধ কেন লা বেগুন ? খোল্ না, কতক্ষণ দাঁড়াব !"

প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে একটি বিগত-যৌবনা রোগা লম্বা স্ত্রীলোক, সিল্কের একটা শাড়ী সেলাই করছিল। স্ত্রীলোকটির ঠিক বয়স আন্দাজ করা কঠিন হলেও শিল্কের শাড়ীটি যে সমস্ত উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য খুইয়ে বীভৎস প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌছেছে এটা সহজেই বোঝা যায়।

দরজায় প্রথম আঘাত শুনে বেগুন কিসের আশায় একটু চঞ্চল হয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ীটি বিছানার তলায় লুকোবার চেষ্টা করতে গেছ্‌ল কিন্তু তারপর বাড়ীউলির গলার স্বর শুনে সেটি আর না লুকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললে, "খোলাই আছে, জোরে ধাক্কা দাও।" তারপর আবার সে সেলাইএ মন দিলে।

তার হারান-যৌবনের সমস্ত সম্পদের মধ্যে ঐ কণ্ঠস্বরটুকু বুঝি এখনো অবশিষ্ট ছিল। কণ্ঠস্বরটি ছেঁড়া জুতোর নতুন ফিতার মত একেবারে বেখাপ্পা !

বাড়উলী তার বিপুল বাতগ্রস্ত দেহ নিয়ে অতি কষ্টে এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে বেঁকে আর একপা তুলে উঁচু চৌকাঠটা ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে বললে,—"সে ছোঁড়া ত আজও এল না রে বেগুন—সে এবার ভেগেছে।"

বেগুন কোন কথা না বলে নীরবে শাড়ীটা সেলাই করতে লাগল।

বাড়ীউলী তক্তপোশ কাঁপিয়ে বসে বললে, "বলছিলুম কি, এই বেলা তোর তাগা জোড়াটা বিক্রি করে ফেল্ ; শশীর বাবু ত শশীকে

একথা শশী ছাড়া আর কারুর মুখ থেকে বেরুলে মাসী সহ্য করত না। কিন্তু শশীর এখন রাজপাট ; সুতরাং অতিকষ্টে কথাটা হজম করে মাসী বললে, "বেশ আমি না হয় ধুমসি, তুই না হয় রূপসী, তা বলে তোর মাসী ত, তুই পারিস বলেই সাধছি নইলে আর কাউকে কি বলতে গেছি ?"

মনস্তত্বে মাসীর অশিক্ষিত পটুত্ব ছিল। রূপসী বলায় ও ক্ষমতার উল্লেখে খুশী হয়ে শশী বললে, "আচ্ছা চ দেখি, বাবু গাড়ি আনতে গেছে।"

ঝগড়া হঠাৎ থেমে যাওয়ায় দরজায় ভিড় হাল্কা হয়ে গিয়েছিল। বেগুন ইতিমধ্যে নীরবে টীনের ভাঙ্গা পেঁটরা থেকে কাপড়-চোপড় বার করায় মন দিয়েছে।

'সায়েবদের মেলায়' যাবার আশায় আপাততঃ রাগটা কিছু ভুলে, মাসী শশীকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "খোরাকী আর ভাড়া না পেলে বাছা, বলে যাচ্ছি, কাল থেকে আমার বাড়ীতে আর তোমার জায়গা হবে না।"

"আচ্ছা আজই ভাড়া দেব।" বলে বেগুন দরজাটা সশব্দে ভেজিয়ে দিলে। এখন তাড়াতাড়ি সাজ-পোশাক তার না করলে নয়। আজকের এই একজিবিশনই তার একমাত্র আশা। সত্যই ছ'মাস তার ঘরে কেউ আসে নি, ছ'মাস ধরে মাসীর কাছে ধারে খাচ্ছে। প্রদীপের তেলটুকুও আজ ক্ষ্যান্তর অনুপস্থিতিতে তার ঘর থেকে না বলে নিয়ে এসেছে। মাসী যে পয়সা না পেলে এতদিনের বাসিন্দা বলে একটুও খাতির রাখবে না একথা সে ভাল রকমই জানে। আজ কোন রকমে শিকার হাতড়ান চাইই। তাই মান্ধাতার আমলের সিল্কের শাড়ীটা এতক্ষণ ধরে সে সেলাই করেছে। আজ একজিবিশনে গেলে, রাত্রের মত খাওয়া বন্ধ জানলেও এখন জলখাবারের জন্যে অপব্যয়

করবার তার একটা পয়সাও নেই। তার শেষ পয়সাকটি টিকিট কেনবার জন্যে রাখতেই হবে। প্রদীপের স্তিমিত আলোর সামনে সে চুলটা বাঁধতে গেল।

ডানদিকে কপালের ওপরেই চুল অত্যন্ত পাতলা হয়ে টাক পড়বার মত হয়েছে, সেখানটা যথাসাধ্য অন্যদিকের চুল টেনে ঢেকে সে খোঁপা বাঁধলে। একটি মাত্র ভাল যে সেমিজ ছিল তা ধোপা বহুদিন থেকে পয়সা না পেয়ে আর ফেরত দিয়ে যায় না—সুতরাং পুরোন আধ-ময়লা সেমিজটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। পাউডারের কৌটো বহুদিন খালি! কেরোসিনের ডিবের আলোয় খড়ির গুঁড়ো ধরা পড়ে না কিন্তু একজিবিশনের উজ্জ্বল আলোতে খড়ির গুঁড়ো মেখে যেতে তার সাহস হ'ল না। দুই চোখের কোণের কালীভরা কোটর, লুকোবার কোন উপায় নেই। তাদের ব্যবসায়ে ভাল সাজ-পোশাকের মূল্য যে কত, তা সে বেশ জানে, বিশেষতঃ এই যৌবনের পারে এসে মানুষের চোখে ধাঁধা লাগাতে হলে সাজ-পোশাকের অন্তরালে আসন্ন-বার্ধক্যের কুশ্রীতা গোপন না করলে যে চলতেই পারে না। কিন্তু বেশ-ভূষা দূরের কথা, কিছুদিন ধরে দু'বেলার উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ অন্নসংস্থান করাও তার পক্ষে বিশেষ কঠিন হয়ে উঠেছে! যে তাগা জোড়া বিক্রি করবার পরামর্শ দিতে এসে মাসী এইমাত্র ঝগড়া করে গেছে, সেই তাগা জোড়াটা বার করে নিয়ে সে পরলে। কেন সে তাগা বিক্রি করতে চায় না, তা যদি মাসী জানত! তার শেষ সোনার অলঙ্কার যে বহুদিন আগে অভাবের তাড়নায় বিক্রি হয়ে গেছে, একথা জানিয়ে, তার তাগা জোড়া এবং সমস্ত গহনাই যে গিল্টি এই সংবাদ দিয়ে, সে আর বাড়ীর সবার কাছে ছোট হ'তে চায় না।

শেষকালে কিন্তু শশীর কথা মনে ক'রে সে তাগা জোড়া খুলে

রাখলে। বহুদিন আগে তার এক শৌখীন সাহেবি-ঘেঁষা প্রণয়ী জুটেছিল। সে তাকে জুতো পরিয়ে বিবি সাজিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। জরি দেওয়া এক জোড়া হিল-তোলা জুতো বহুদিন পেঁটরার এক কোণে অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল। আজ সেটিকে বার ক'রে ভাল করে পরিষ্কার ক'রে সে অনেকদিন বাদে পায় দিলে। জুতোর সঙ্গে তাগা মানাবে না ভেবেই, সে তাগা জোড়া খুলে রেখেছিল।

সাজ-গোজ সমাপ্ত ক'রে যখন সে পথে বেরুল তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অনেকখানি পথ হেঁটে যেতে হবে। অনেক দিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে চলতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল কিন্তু একেবারে অনভ্যস্ত নয় বলে তার চাল-চলন নিতান্ত অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিল না।

চৌরঙ্গীর চৌমাথা পার হবার সময়, দু'জন লোক তার সম্বন্ধে একটা অভদ্র ইঙ্গিত ক'রে হেসে উঠল। তার আকর্ষণীশক্তি একেবারে লোপ পায় নি মনে ক'রে বেগুন একটু খুশীই হল।

টিকিট বিক্রেতা মনস্তত্ত্ববিদ্ নয়; তাদের সে অবসরও নেই, নইলে সেদিন দক্ষিণ তোরণের টিকিট-ঘরের কাউণ্টারে টিকিট নেবার সময় একটি শিরওঠা কঠিন সৌষ্ঠবহীন হাতের কাঁপুনিতে তারা অনেক কিছু দেখতে পেত। এটি বেগুনের শেষ আধুলী।

আলোকের উন্মত্ত উৎসব। অসংখ্য উৎসবমত্ত মানুষের কোলাহলের সঙ্গে দূরের ব্যাণ্ডের অপরিস্ফুট সুরধারার মাধুর্য ও সমস্ত আনন্দ সমারোহের ওপর অতল গভীর আকাশের স্নিগ্ধ নক্ষত্রখচিত রহস্যাবরণ,—সমস্তই বেগুনের কুটিল পথক্লান্ত জীবনের,—নিত্য অবহেলায় মরচেপড়া মনের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল।

মেহেদি গাছের বেড়া দেওয়া বাঁদিকের অপেক্ষাকৃত নির্জন পথটা

দিয়ে সে এগিয়ে চলল। দুর্বল শরীরে এতখানি হেঁটে এসে এখন সে বেশ ক্লান্ত। বুকের ভেতর পুরানো বেদনাটা তাকে পরিহাস করবার জন্যই যেন মাঝে মাঝে চিড়িক দিয়ে উঠছিল। কিছুদূর গিয়েই অল্প অন্ধকারে একটা খালি বেঞ্চি দেখে কিছু জিরিয়ে নেবার জন্যে সে বসে পড়ল। এ পথটা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত অপেক্ষাকৃত কম। সামনেই একটা বৈদ্যুতিক বাতির পোষ্ট, কিন্তু তাতে আলো ছিল না। বেগুন কতকটা নিজের অজ্ঞাতে ও কতকটা সজ্ঞানে আসন্ন সংগ্রামের জন্যে যেন শক্তি সংগ্রহ করছিল। কিছুক্ষণ অবসন্ন ভাবে বসে থাকবার পর হঠাৎ পাশে চোখ পড়াতে সে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে উঠল। তার অলক্ষ্যে কে একজন বেঞ্চির অন্য পাশে এসে বসেছে! অন্ধকারে তার মুখ ও বেশভূষা ভাল ক'রে দেখা না গেলেও, সে যে পুরুষ এবং বলিষ্ঠ পুরুষ তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না। বেগুন সজাগ ও উদ্‌গ্রীব হয়ে ভাল করে বসল। ডান পায়ের জুতো মাটিতে ঠুকে বার কয়েক শব্দ করলে এবং মাথার কাপড় ফেলে হঠাৎ খোঁপার কি ত্রুটি শোধরাতে বিশেষ করে মন দিলে।

সামনের বাতিটা কোন কারণে নিশ্চয় খারাপ হয়েছে। একজন মিস্ত্রী সেটা জ্বালাবার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ বাতিটা পলকের জন্যে জ্বলেই নিভে গেল। ঐ পলকটিতে লোকটাকে দেখে নেবার সুযোগ কিন্তু বেগুনের হয়নি। যাই হোক লোকটা তাকে দেখতে পেয়েছিল নিশ্চয়ই। অন্ততঃ সেও এবার তার দিকে একটু পাশ ফিরে একটা পায়ের ওপরে পা তুলে দিয়ে বসল। মাথার খোঁপার কাল্পনিক ত্রুটি শুধরে বেগুন বেশ একটু জোরেই হাতটা নামালে। হাতের গিল্টির চুড়িগুলি বেজে উঠল—রিন্‌ঠিন্‌রিনিঠিন্‌।

অন্ধকার হলেও বোঝা গেল লোকটা তার দিকেই চেয়ে আছে; কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেও তার দিক থেকে অগ্রসর হবার

কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না। বেগুন একটু অধীর হয়ে উঠল। তবে কি লোকটা এখনও বোঝেনি, না কোন গোবেচারী গোছের হাবা ভূবো হবে?

আলোটা জ্বলে না কেন? কিন্তু এই বেশ-ভূষা নিয়ে আলোর চেয়ে অন্ধকারই যে তার পক্ষে সুবিধার একথা সে জানত। কিরকম লোক না জেনে আরো অগ্রসর হওয়া উচিত হবে কি না ভাবছিল এমন সময় লোকটা একবার কাশলে! বেগুনও জবাব দিল কাশিতে। লোকটা আবার কাশলে!

বেগুনের বুকটা আশায় দুলে উঠল! এ যে জোর করে নকল কাশবার চেষ্টা, তা বোঝা আর কঠিন নয়। আঁচল থেকে ধীরে চাবিটা খুলে বেগুন পায়ের কাছে ফেলে দিলে। তারপর খানিক খোঁজবার ভান করে লোকটার দিকে ফিরে বললে, "আপনার কাছে দেশলাই আছে? আমার চাবিটা একটু খুঁজে দেখব—"

লোকটা চমকে উঠল। সত্যি সে কণ্ঠস্বর চমকাবার মত। এই কণ্ঠস্বরটিতে এখনও কৈশোরের অপরূপ কোমলতা ও যৌবনের অসীম মাধুর্য ও স্নিগ্ধ মাদকতা অটুট হয়ে আছে।

এই পতিতার জীর্ণ জীবনের জঞ্জালে এই সদ্য-ফুট শেফালির মত সৌরভশুচি কণ্ঠস্বর কেমন করে থাকতে পারে এইটেই আশ্চর্য! লোকটা চমকে উঠেছিল কারণ সে এতটা আশা করে নি।

নীরবে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে বেগুনের প্রসারিত হাতে সে গুঁজে দিল।

বেগুন নীচু হয়ে দেশলাই জ্বেলে চাবি খোঁজবার ছল করবার মধ্যেই টের পেলে লোকটা আর একটু সরে এসে বসেছে।

সামনে ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা আর একবার জ্বলে উঠল কিন্তু বেগুন মুখ তুলে লোকটাকে দেখবার আগেই আবার গেল নিভে! বেগুন

মনে মনে বাত্তির ও বাতিওয়ালার সপ্তম পুরুষ উদ্ধার করে আবার আর একটা দেশলাই জ্বাললে। বাতিটা যেন ইচ্ছে করেই তার সঙ্গে তামাশা করছিল। এবার আর চাবী খুঁজে পেতে দেরি হল না। দেশলাইটা ফিরিয়ে দেবার ছলে বেগুন লোকটার হাতে একটা আঙুল দিয়ে ধীরে আঘাত করলে, তারপর আর একটু ঘেঁষে বসল। বললে, "ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, নইলে এই অন্ধকারে চাবী খোঁজা কি সোজা!—"

লোকটা কোন উত্তর দিলে না, শুধু অন্ধকারে একটা হাত বেগুনের কোমরে এসে ঠেকল! বেগুন সে হাতটা বাঁ হাতের মুঠোয় খপ করে ধরে ফেলে একটু চাপ দিলে। অন্ধকারের মধ্যে স্পর্শ করে বেগুন অনুভব করছিল, হাতটা অত্যন্ত লোমশ ও তার চামড়া অত্যন্ত কর্কশ—লোকটা দেখতে খুব সুশ্রী বোধ হয় হবে না—তা না হোক!

বার কয়েক মিট্ মিট্ করে সামনের বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠল।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় আতঙ্কে লোমশ হাতটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেগুন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। লোকটার উপরের ঠোঁট একেবারে নেই—মাড়ি থেকে লম্বা অপরিষ্কার দাঁতের পাতি, ভয়ঙ্কর ক্ষত থেকে বেরিয়ে এসে সমস্ত মুখটাকে বীভৎস করে তুলেছে, আর তার বাঁ দিকের সমস্ত গাল কবে যেন আগুনে ঝলসে পুড়ে বিবর্ণ মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে!

লোকটা বেগুনের এই আতঙ্কে একটুও হতভম্ব হয় নি এমন নয়, কিন্তু সে যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। বেগুন তার দিকে আর না চেয়ে এগিয়ে চলল। অনেক সময় ও অনেক কলা-কৌশল তার বৃথা নষ্ট হয়েছে সত্য কিন্তু তা বলে ঐ দুঃস্বপ্নের সঙ্গে সে স্ফূর্তি করতে পারে না। এর চেয়ে ভাল শিকার সে নিশ্চয় যোগাড় করতে পারবে।

অনেক দিন বাদে জুতো পায়ে দিয়ে অতখানি হেঁটে পায়ে ফোস্কা পড়েছিল। একটানা চলার সময় তার বেদনা বিশেষ কিছু অনুভব না করলেও অনেকক্ষণ জিরোবার পর এখন হাঁটা একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এখন জুতো খুলে ফেলাও অসম্ভব, খুঁড়িয়ে হাঁটলেও হাস্যাস্পদ হ'তে হয় সুতরাং যন্ত্রণা গোপন করে সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক ভাবে হাঁটবার চেষ্টা করছিল। তাকে হাঁটিতেই হবে যে। কিছুদূর গিয়ে একবার সে পেছন ফিরে তাকাল। লোকটা তখনও তার দিকে চেয়ে সেই বেঞ্চিতেই বসে আছে।

নির্মম জুতোর নিঃশব্দ পীড়ন সহ্য করা বিশেষ কঠিন হয়ে উঠলেও সে অনেকক্ষণ নানাদিকে ঘুরে বেড়াল। মেলার মজা ও আমোদ লক্ষ্য করবার মত মনেব অবস্থা তার নয়। চারিদিকে ক্ষুধিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শিকার অনুসন্ধান করাতেই সে একেবারে তন্ময়। যত সময় যাচ্ছিল তার আশঙ্কা ও অস্থিরতা তত বেড়ে উঠছিল। এ পর্যন্ত কোন সুবিধা সে করতে পারে নি। কয়েকজন নিঃসঙ্গ পুরুষের আশে পাশে ঘুরে বেড়িয়ে ও কয়েকজনকে দৃষ্টির ইঙ্গিতে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে কোন ফল হয় নি।

শাখায় শাখায় লাল বাতি-দেওয়া ঝাঁকড়া একটা গাছের তলায় বেশী ভিড় জমেছে। সেটা জুয়ার আস্তানা। লোহার আলের ওপর ঘুরে ঘুরে একটা ছ-কোণা কাষ্ঠখণ্ড খেলোয়াড়দের ভাগ্য নিরূপণ করছিল। বেগুন যখন গিয়ে সেখানে দাঁড়াল তখন ভাগ বাঁটরা হচ্ছে—এক তরফা খেলা শেষ হয়ে গেছে।

একটি বামনাকার স্থূলকায় লোক স্মিতবদনে এক তাড়া নোট পকেটে রাখছিলেন। খুশীতে তার দু'ভাঁজ চিবুক তিন ভাঁজ হয়ে উঠেছে। বেগুন ঠেলেঠুলে তাঁর পাশে জায়গা করে নিলে। তার ঠিক বিপরীত দিকে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে একটি ফিরিঙ্গি যুবকের

কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কি বলছিল। তাদের কথাবার্তা না বুঝলেও হাব-ভাবে বেগুন বুঝতে পারলে ছেলেটি সম্প্রতি অনেক লোকসান দিয়ে আর খেলতে না চাইলেও মেয়েটি তাকে ছাড়তে দিতে চায় না।

ইতিমধ্যে মোটা ভদ্রলোক পাঁচ নম্বরে একটা দশ টাকার নোট ধরেছেন। আবার কাষ্ঠখণ্ড ঘুরল! তারপর চারিদিক থেকে কোলাহল উঠল, চার নম্বর মার দিয়া!

মোটা ভদ্রলোকটি রাগে টেবিল চাপড়ে আর একটা দশ টাকার নোট বার করলেন। ওদিকে ফিরিঙ্গি ছেলেটির সাথে মেয়েটির বচসা শুরু হয়েছে। ছেলেটি এবারেও হেরেছে ও মেয়েটি আর একটি ফিরিঙ্গির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খানিক বচসা করে ছেলেটি মুখ রাঙা করে চলে গেল। বেগুন মোটা লোকটির আরো কাছে ঘেঁষে একবার জুতো দিয়ে তাঁর পাটা মাড়িয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ আবার ক্ষমা চেয়ে সে বলতে যাচ্ছিল, "মাপ করবেন দেখতে পাইনি।" কিন্তু লোকটির কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, তিনি তার জুতোর চাপ টেরই বোধ হয় পাননি!

আবার খেলা শুরু হ'ল। এবার নম্বর উঠল 'দুই'। মোটা লোকটির টাকা ছিল তিনে।

পেছন থেকে একটা ধাক্কা এল! বেগুন সামলাতে না পেরে ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরলে।

"এইও পাজী বদমাশ!" ভদ্রলোক এক ঝটকায় তার হাত দু'টো ছাড়িয়ে তাকে অন্য পাশে ছিটকে দিলেন। বেগুন এবার সত্য সত্যই অতি কষ্টে পেছনের লম্বা চওড়া এক শিখের গায়ে ভর দিয়ে টাল সামলাল।

"আরে ছিঁয়ে ত মর্ যাওগে" বলে শিখ তাকে ভিড় থেকে ঠেলে বার করে দিলে। সে অন্যদিকে ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ভেতরে

ঢুকতে আর তার সাহস হচ্ছিল না। ভিড়ের বাইরে সে এর পর কি করা যায় ভেবে পেল না।

যে সব পথে, সারি সারি আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত দোকানের সামনে দিয়ে অসংখ্য লোকজন যাতায়াত করছিল সেখানে তার যাবার উপায় নেই! তার সাজ-সজ্জায় অসংখ্য ত্রুটি, তার অস্তমিত যৌবনের কুশ্রীতা সেখানে আলোকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাবে। নিশাচর শ্বাপদের মত তার অন্ধকারের সঙ্গেই আত্মীয়তা। একটি বয়স্ক সুবেশ বলিষ্ঠকায় ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাবার সময় তার দিকে একবার চেয়ে গেলেন। খানিক দূর গিয়ে আর একবার ফিরে চাইলেন, তারপর ডানদিকের ঝিলের ওপরকার ছোট সাঁকো পার হয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বেগুন সন্দিগ্ধ মনে তাঁর পিছু নিল। সাঁকো পার হয়ে একটা ছবির ঘরে গিয়ে বেগুন আবার তাঁকে দেখতে পেলে। ভদ্রলোক ব্যস্ত ভাবে যেন কি খুঁজছিলেন। সে বিপরীত দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছবির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে। ভদ্রলোক বোধ হয় তাকে লক্ষ্য করেন নি। হঠাৎ বেগুন তাঁর দিকে ফিরে বললে "আচ্ছা তের বছরের মেয়ে এমন ছবি আঁকতে পারে?"

ভদ্রলোক বোধ হয় শোনেন নি, কোন উত্তর দিলেন না। তার পাশ থেকে কে মিহি গলায় বললে "হাঁ, তের বছরের মেয়ে আবার অমনি আঁকতে পারে! ও অমনি বাড়িয়ে লিখেছে।"

পেছনে শশী, তার জিরাফ-গর্দান, কাঠঠোকরা-মুখো বাবু ও মাসীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে! বেগুন আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল। মাসী একবার তার বেশের দিকে চেয়ে নাক সিঁটকে মুখ ফেরালে। শশী একটু হাসল। কিন্তু তখন শশীর সালঙ্কারা সৌভাগ্য-গর্বিত যৌবনের সঙ্গে নিজের তুলনা করে ঈর্ষান্বিত হবার সময় তার নেই। ভদ্রলোক

বেরিয়ে গেলেন; বেগুন তাঁর পিছু নিলে। মাসী পেছন থেকে বলছে শুনতে পেলে, "ওই রূপের আর দেমাক দেখে বাঁচি না—"

ভদ্রলোক বেশ জোরে হাঁটছিলেন। হয়ত এ অনুসরণে কোন লাভ হবে না ভেবেও এবং পায়ের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বেগুন যথাসাধ্য জোরে হাঁটতে শুরু করলে। প্রকাণ্ড একটা নাগরদোলার সামনে গিয়ে তিনি থামলেন। বেগুন এবার মরিয়া হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাতটা খপ্ ক'রে ধরে ফেলে বললে—"আসুন না ঐ চেয়ারটা খালি আছে!"

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বিমূঢ় হয়ে তার দিকে ফিরে চাইলেন। ভদ্রলোক শুনতে পান নি ভেবে বেগুন কম্পিত বুকে, হাতে একটু টান দিয়ে বিবর্ণ মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে আবার বললে, "আসুন না ওই দোলাটায় একবার চড়ে আসি।" কিন্তু পর মুহূর্তেই সভয়ে তাঁর হাত ছেড়ে দিলে। ভদ্রলোকের মুখে চোখে অসীম বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ ফুটে উঠেছে। এতখানি নির্লজ্জ দুঃসাহস দেখে তিনি স্তম্ভিত। ক্রোধ কটুকণ্ঠে তিনি বললেন "তোমার এই বেয়াদবীর জন্যে তোমায় পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি জান?—নচ্ছার পাজী মেয়েমানুষ কোথাকার!—"

বহুদিনের পুরাতন বেদনাটা আবার বুকের পাঁজরায় পেরেক ঠুকছিল। ভদ্রলোক বলছিলেন "তোমার এতবড় আস্পর্ধা—"

হঠাৎ পাশ থেকে একটি ছেলে ডাকলো, "বাবা! ও মা এই যে বাবা।" আধা ঘোমটা দেওয়া একটি স্ত্রীলোক কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বেগুন ভদ্রলোকের ক্ষণিকের অন্যমনস্কতার সুযোগে সেখান থেকে সরে গেল। খানিক দূর গিয়ে একটা চেয়ারে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মাথাটা ঘুরছে, চোখেও কেন একটু ঝাপসা দেখছে—এখন যদি একটু মদ পাওয়া যেত!

কিন্তু ক্রমশঃ সময় যাচ্ছে। আজ যাহোক কিছু রোজগার করা চাই-ই। এখন মনে হচ্ছিল, সেই প্রথম শিকার অবহেলা করা হয়ত উচিত হয়নি কিন্তু সে যে ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। কিছুক্ষণ পরে এক জড়ভরতকে কাঁধে ভর করিয়ে এনে একটি মেয়ে তার সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলে। মেয়েটি যে তারই সম-শ্রেণীর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু এই অষ্টাবক্র মূর্তিমান জরাকে কোথা থেকে সে পাকড়াও করলে!

বুড়োকে চেয়ারে বসিয়ে মেয়েটা বলে, "খবরদার এখান থেকে নড়িস নি বুড়ো; তাহলে তোর হাড়মাস আর এক জায়গায় রাখব না।" বুড়ো সুরা-জড়িত কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে কি কি বলল বোঝা গেল না। মেয়েটা বললে, "দে টাকা এক বোতল আনি।" তারপর বুড়োর পকেটে হাত দিলে। কিন্তু এ বিষয়ে বুড়ো এখনও খুব সজাগ; সে আর্তকণ্ঠে বিকৃত স্বরে চীৎকার ক'রে বললে "ঐ নিলে, সব চুরি ক'রে নিলে!" মেয়েটা বিরক্ত হয়ে পকেট থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, "দে তবে হতচ্ছাড়া তুই নিজেই দে।" বুড়ো পকেট থেকে একটা নোট কম্পিত হাতে বার ক'রে দিলে; মেয়েটা চলে গেল।

বেগুন নীরবে সমস্ত লক্ষ্য করছিল। বুড়োর যেমন রূপ তেমনি বেশ। তার দেহের গঠন দেখলে মনে হয়, মাত্র সম্প্রতি সে চতুষ্পদে চলা ত্যাগ করেছে। তার কুৎসিত মুখের লোল-মাংস ও প্রতি রেখায় সারাজীবনের পৈশাচিক ইতিবৃত্ত লেখা। বেশ তার অদ্ভুত। শীর্ণ দেহে একটা ময়লা চাপকান এবং সে চাপকানের ওপর আবার এক দুর্গন্ধ নোংরা চাদর। গলায় কম্ফর্টার জড়ান, পাকাটির মত সরু ও ধনুকের মত বাঁকা পায়ে লাল মোজা ও ক্যাম্বিশের ছেঁড়া জুতো। ঐ ধ্বংসাবশেষের মাঝে মৃত্যুর ভ্রূকুটির তলেও কদর্য কামনার বীভৎস

উৎসবের লীলা আজও থামে নি। বেগুনের নিঃসাড় মনেও ঘৃণা ও বেদনা জাগছিল।

কিন্তু বৃদ্ধের পকেট টাকায় ভরা! ঐ মেয়েটার বদলে যদি সে নিজে আজ একে শিকার করতে পারত, কিছু দিনের দুর্ভাবনা অন্ততঃ ঘুচত। একবার ইচ্ছে হ'ল যে মেয়েটার অনুপস্থিতিতে বুড়োকে ভুলিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যায়। কিন্তু সাহস হ'ল না। মেয়েটা যদি আর না আসে, তা হ'লে হয়ত ভালো হয় কিন্তু সে সম্ভাবনা খুব কম। মেয়েটার কিন্তু অনেক দেরি হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মেয়েটিকে আর ফিরতে না দেখে বেগুন অবশেষে আর নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারলে না। বৃদ্ধ বোধ হয় ঝিমোচ্ছিল। ধীরে ধীরে তার কাছে গিয়ে বস্‌ল। পকেট থেকে মনিব্যাগটা উঁকি মারছিল। একবার ইচ্ছে হ'ল, এই অবসরে মনিব্যাগটা নিয়ে সরে পড়ে, কোন হাঙ্গামা নেই, কেউ দেখতেও পাবে না। কিন্তু সে সাহস হ'ল না বুড়ো সে সুযোগ দিলেও না, হঠাৎ চোখ চেয়ে বললে, "কে রূপো এলি? দে বোতল দে!"

বেগুন বললে "আমি রূপো নই—"

"আচ্ছা তুই সোনা, দে এখন বোতল দে।"

সে হাত বাড়ালে।

"বা, আমি বোতল কি জানি!"

বুড়ো এবার চটে উঠে বললে, "আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? দে বলছি বোতল।"

বেগুন বুড়োকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, "মর বুড়ো, আমি কি তোর রূপো, তোর রূপো চম্পট দিয়েছে।"

বুড়ো এবার সচেতন হয়ে উঠল। বেগুনের দিকে চেয়ে বললে, "কোথায় গেল রূপো! তুই কে!" তারপর দুর্বল পায়ে উঠবার

চেষ্টা করলে। বেগুন তাকে নিরস্ত করতে গেল। বুড়ো চীৎকার করে বললে "না-না আমার রূপোকে খুঁজব, ছাড় তুই মাগী।" কিন্তু ওঠবার ক্ষমতা ছিল না, বেঞ্চিতে আবার টলে পড়ল। বেগুন, বৃদ্ধের গলা বাহু দিয়ে বেষ্টন করে বললে, "রূপো থাকগে, আমি তোকে বোতল দেব, চল আমার সঙ্গে।"

"না-না আমার রূপোকে চাই।" বৃদ্ধ বেগুনের বাহুর বেষ্টন থেকে মুক্ত হবার দুর্বল চেষ্টা করতে লাগল। বৃদ্ধের বুকে মাথাটা রেখে ফুঁপিয়ে কান্নার অভিনয় করে এবার বেগুন বলল, "কে তোর রূপো? তোকে ফেলে সে পালিয়ে গেল আর আমি তোকে সাধছি তবু আমায় পায়ে ঠেলছিস্।" অভিনয়ে চির অভ্যস্ত এই পতিতার পঙ্কিল হৃদয়ও সে জঘন্য অভিনয়ে বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছিল—কিন্তু উপায় নেই।···

বুড়োকে রাজী করিয়ে অনেক কষ্টে তাকে গেটের কাছাকাছি এনে বেগুনের একটু আশা হ'ল। এই দুর্বল অসুস্থ শরীরে এই অথর্ব বৃদ্ধের ভার বয়ে আনা সহজ নয়। বেগুনের সমস্ত দেহ ভেঙে পড়তে চাইছিল কিন্তু গেটের কাছে পৌঁছালেই কিছুদিনের মত দুঃখের অবসান হবে ভেবে, আবার সে প্রাণপণে এগিয়ে চলল। হঠাৎ পেছন থেকে কে হাঁকলে, "এই ও খাড়া হো যাও—"

বেগুন তখনও এগিয়ে চলছিল। লাল পাগড়ী-পরা পাহারা-ওয়ালা পেছন থেকে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, "এত্তা চিল্লাতা, শুন্‌তা নেহি?"

সভয়ে বেগুন দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃদ্ধের শিথিলপ্রায় দেহ তার কাঁধেই ঝুলছে।

"ইতো মাতোয়ালা হ্যায়, ছোড়্‌দো ইস্‌কো—।"

বৃদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে বললে, "হ্যাঁ বাবা মাতাল হ্যায়।" বেগুন হতাশ

হয়ে শেষ চেষ্টা করে বললে, "আমার স্বামী যে, পাহারাওয়ালা সাহেব!"

দু'চারজন লোক্ মজা দেখতে জড় হয়েছিল, তারা হেসে উঠল।

কুৎসিৎ ভাষায় বেগুনকে একটা ধমক দিয়ে পাহারাওয়ালা বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে গেল! অনেকদিন বাদে বেগুনের চোখ সজল হয়ে উঠেছিল বোধ হয়।

লোকের ভিড় অনেক কমে গেছল। রাত্রি এখন অনেক। যে পথে প্রথম একজিবিশনের ভেতর গিয়েছিল সেই পথেই আবার বেগুন চলতে আরম্ভ করলে। এখন তার মনে হচ্ছিল প্রথম সুযোগ ত্যাগ করা তার ভয়ানক বোকামী হয়েছে!—তার আবার রূপের বিচার!

বেঞ্চিটা দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল। তার উপর কে যেন শুয়ে আছে মনে হ'ল। ভাগ্যের এত পরিহাসের পর আর দুরাশা করবার তার সাহস ছিল না। কিন্তু নিজের সৌভাগ্য সে প্রথম বিশ্বাস করতেই পার্‌ল না! যাকে দেখে সে কিছুক্ষণ আগে আতঙ্ক শিউরে উঠেছিল তার সেই বীভৎস মূর্তিই খানিক পর তার এত আনন্দের কারণ হবে একথাও সে কল্পনা করতে পারেনি। সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নই বেঞ্চির উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। মনের অদ্ভুত বিতৃষ্ণাভরা আনন্দ দমন করে সে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললে, "রাত ত অনেক হয়ে গেছে!" এই জাগানোর অধিকার নিয়ে কোন সন্দেহ কোন সঙ্কোচ কোন দ্বিধা তার মনে আর ছিল না।

লোকটা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে তার দিকে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লোকটার গায়ে খাকি ছেঁড়া কোট, পরণে আধ ময়লা কাপড়

দেখে দরিদ্র মিস্ত্রী-টিস্ত্রী হবে বলে মনে হয়। লোকটার হাত ধরে তুলে বেগুন কিন্তু অবিচলিতভাবে বললে, "চল, যাবে না ?"

প্রথম ঘুমের ও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে লোকটা দু'হাতে চোখ রগ্ড়ে উঠে দাঁড়াল। মেলায় লোক আর ছিল না বললেই চলে। তারা দু'জনে পাশাপাশি এগিয়ে চলল। ক্ষুধায় শ্রান্তিতে বেগুনের পা আর চলছিল না। খাবারের দোকানের সামনে এসে বেগুন তাকে থামিয়ে বললে, "দাঁড়াও, কিছু খাবার আনি, কিছু রেস্ত বের কর দেখি।"

লোকটা ধীরে ধীরে একে একে তিনটে পকেটের ভেতরকার কাপড় উল্টে দেখালে।

কিছুক্ষণ নিঃসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে বেগুন তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলতে লাগল, "মিনি-পয়সায় ইয়ার্কি দিতে এসেছ হারামজাদা চোর!—"

লোকটা নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্তরের কোন ভাবই মুখের বিকৃত ভগ্ন আয়নায় প্রতিফলিত হবার নয়। বেগুন হতাশ হয়ে আব একবার তার পকেট ও পয়সা লুকোবার সমস্ত সম্ভব স্থান নিজে হাতড়ে দেখলে। একটি দেশলাই ও গুটিকতক বিড়ি ছাড়া তার কোন সম্বল নেই।

দাঁতে দাঁতে চেপে অসীম অসহায় হতাশায় কপর্দকহীন সেই মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের হাত ধরেই বেগুন বললে "চল—"

এবার তাদের পথে কেউ বাধা দিলে না।

দিবা-স্বপ্ন

শনিবারের দুপুর।

কোর্টের সকাল সকাল ছুটি হইয়াছে। বালিগঞ্জ হইতে আড়াইটার ট্রেণ ধরিবার জন্য রমেশ তাড়াতাড়ি বাজার সারিয়া ট্রামে উঠিয়াছিল। এক হাতে তাহার খড় দিয়া বাঁধা একটা ভেটকী মাছ, আর এক হাতে বেগুন আলু অন্যান্য তরি-তরকারী ও বহুমূল্য দু'টি কপি। পাড়াগাঁয়ে থাকিলে কি হইবে রেলের কল্যাণে সেখানে আর কিছু পাইবার যো নাই। রবিবারের দিনটা খাওয়া দাওয়ায় একটু বৈচিত্র্য না হইলে ভালো লাগে না, তাই সে শহর হইতেই এগুলি কিনিয়া লইয়া চলিয়াছে।

মনটা তাহার ট্রামে বসিয়া খুঁত খুঁত করিতেছিল। ট্রেণ ফেল হইবার ভয়ে তাহাকে তাড়াতাড়ি বাজার সারিতে হইয়াছে, দরদস্তুর করিবার সময় পায় নাই। ভেটকী মাছটা হয় ত আরও এক আনী সস্তায় পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহার গরজ বুঝিয়া মেছুনি একেবারে গোঁ ধরিয়া একটি পয়সা ছাড়িতে চায় নাই। বেগুনটার ওজনেও বোধ হয় ঠকিয়াছে। কিন্তু দোকানীকে সে কথা বলিতে গেলে ঝগড়া বাধিয়া যায়। সে সময় কোথায়? যাই হউক কপি দুইটা মন্দ পাওয়া যায় নাই। আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি এমন কপি সচরাচর দেখা যায় না।

অনু নিশ্চয়ই একটু বকিবে। বলিবে, "এত দাম দিয়ে কপি এখন না কিনলে আর চলত না! একটা মাস সবুর করতেও পারলে না!"

তাহার উত্তরে কি বলিবে তাহাও সে জানে—বলিবে, "সবুর ত করব, কিন্তু মরে যদি যাই তাহলে কপির শোক যাবে না।"

অনু তখন রাগ করিয়া ঠোঁট দু'টি ঈষৎ ফুলাইয়া নিশ্চয় বলিবে, "আহা কথার কি ছিরি! ওই জন্যে ত তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাই না।"

তাহাকে আরো রাগাইবার জন্য তখন বলিতেই হইবে, "কি জন্যে? মরে যাব বলে?"

অনু বলিবে—'যাও'।

রমেশের কাল্পনিক দাম্পত্য আলাপ আরও কতদূর গড়াইত বলা যায় না, কিন্তু খট্ করিয়া মাঝপথে ট্রাম থামিয়া গেল।

হয়ত কোন প্যাসেঞ্জার উঠিতেছে ভাবিয়া রমেশ নিশ্চিন্ত মনে আবার ছেঁড়া কল্পনার সূত্র জোড়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময় ট্রাম চালকের আচরণ দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত, পরে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। মাথার টুপি খুলিয়া জামার বোতাম আলগা করিয়া দিয়া ড্রাইভার তখন ট্রামের পাটাতনে বসিয়া ক্লান্ত পা দুইটাকে বিশ্রাম দিবার আয়োজন করিতেছে।

ট্রামের তারে 'কারেন্ট' নাই।

কারেন্ট শীঘ্রই আসিবে আশা করিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে আরো পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল। তবু ট্রামের নড়িবার লক্ষণ নাই।

রমেশ অধীর হইয়া উঠিতেছিল। আড়াইটার ট্রেণ না ধরিতে পারিলে সেই চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। মাঝে যে কটি ট্রেণ আছে তাহা ক্যানিং লাইনের নয়। সোনারপুরে গিয়া বদল করিতে হয়। এ ট্রেণ ফসকাইলে আজকার বিকালটাই মাটি।

বিকালে তাহার অনেক কাজ। রবিবারের দিনটা সে একেবারে নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম করিতে চায়। তাই তাহার যা কিছু কাজ সে শনিবার বিকালের মধ্যেই সাধারণতঃ সারিয়া লয়। আড়াইটায় ট্রেণে না ফিরিলে কোন কাজই তাহার হইবে না।

পিসিমার পীড়াপীড়িতে কৈবর্ত্ত পাড়ায় গিয়া আগের দিন সে গাভীন একটা ছাগল দর করিয়া আসিয়াছে। ছাগলের মালিকের আজ ছাগল লইয়া আসিবার কথা। লোকটা এতদূর হাঁটিয়া আসিয়া অপেক্ষা করিয়া হয়ত ফিরিয়া যাইবে। হয়ত আর কাহাকেও বিক্রিই করিয়া ফেলিবে। ছাগলটা ভালো জাতের, বেশ দাঁও-য়েই পাওয়া যাইতেছিল। হয়ত ফসকাইল।

অনু সত্যই তাহা হইলে ক্ষুণ্ণ হইবে। ছাগল কিনিবার কথার সময় অবশ্য সে কৃত্রিম রাগের ভান করিয়া বলিয়াছিল—"পিসিমা এমন করছেন,—আমার বাপু লজ্জা করে। কোথায় কি তার ঠিক নেই, এর মধ্যে ছাগল কেনা হচ্ছে, হেন হচ্ছে তেন হচ্ছে!"

তাহার পর একটু থামিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—"তোমারও মোটে লজ্জা নেই, কি করে বেহায়ার মত পিসিমার সঙ্গে এ সব কথা বল যে বুঝতে পারি না।"

রমেশ হাসিয়া বলিয়াছিল—"আর তুমি যখন বসে বসে কাঁথা সেলাই কর?"

হার মানিয়া 'যাও' বলিয়া অনু পলায়ন করিয়াছিল।

কিন্তু সে কথা থাক। ট্রেণ ফেল কবিলে শুধু ছাগলটা যে ফসকাইবে তাহা নয়, আরও অনেক কাজই হইবে না। উঠানের পাশে নূতন একটা চালা তোলা হইতেছে—পুরান ছোট রান্নাঘরে আর চলে না। সময় খারাপ, ঘরামি পাওয়াই দুষ্কর। অনেক কষ্টে যাহাদের পাওয়া গিয়াছিল তাহারাও এসময়ে ক্ষেতের কাজে মজুরী বেশী বলিয়া বোধ হয় দুইদিন আর দেখা দেয় নাই। ঘর ছাওয়ার বাকী কাজটুকু সারিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের কাছেও অনুরোধ করিতে যাওয়া প্রয়োজন। বিকালে না বলিয়া রাখিলে তাহারা কাল সকালে কিছুতেই আসিবে না, লোকগুলা এমনি বেয়াড়া।

রমেশ অধীর হইয়া ঘড়ি খুলিয়া দেখিল। এখনও আধ ঘণ্টার বেশী সময় আছে। ট্রাম কখন চলিবে তার ঠিক নাই। সে আশায় বসিয়া থাকিলে সম্ভবতঃ আজ আর যাওয়াই হইবে না। তাহার চেয়ে বরং পায়ে হাঁটিয়া গেলে এখনও ট্রেণ ধরা যাইতে পারে। পোঁটলা ও মাছটি লইয়া রমেশ নামিয়া পড়িল।

রৌদ্র অত্যন্ত চড়া, জল বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই, এবং ট্রামেই যাইবে জানিয়া ছাতাটাও আনে নাই। তাহা হোক। রমেশ চলিতে সুরু করিল।

কিন্তু সূর্যদেবকে বেশীক্ষণ উপেক্ষা করা চলিল না। মিনিট পোনরো চলিবার পর তাতিয়া ঘামিয়া রমেশ অস্থির হইয়া উঠিল। গড়িয়াহাট রোডের মোড়ে আসিয়া তখন পৌঁছাইয়াছে। পথ আর সামান্যই বাকী। যে রকম তাড়াতাড়ি আসিয়াছে পাঁচ মিনিট বিশ্রাম করিয়া লইলেও ট্রেণ ফেল হইবার সম্ভাবনা নাই। রমেশ রাস্তার পাশের একটি গাছের ছায়ায় পুঁটলি পোঁটলা নামাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

মিনিট পাঁচেক বিশ্রামের পরও রমেশ সেদিন চেষ্টা করিলে ট্রেণ ধরিতে পারিত—এবং তাহা হইলে আভাষে ইঙ্গিতে যে অনু বা অনুপমার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—তাহাকেই নায়িকা করিয়া এ গল্পকে আর একদিক দিয়া সাজান ছাড়া উপায় ছিল না।

কিন্তু তাহার প্রয়োজন হইল না। একটু বিশ্রাম করিয়া লইয়া রমেশ আবার চলিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় পিছন হইতে একটি মোটরকার নিকটে আসিয়া ঘট্ করিয়া থামিয়া পড়িল।

সুশ্রী সুঠাম একটি টু-সিটার-কার এবং তাহার চালকের আসনে বসিয়া একাকী একটি মহিলা।

মহিলাটি গাড়ি হইতে মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

—"এখানে কাছাকাছি কোথায় পেট্রোল পাম্প আছে বলতে পারেন ?"

পেট্রোলের খবর রমেশ রাখে না। তবু তাহার মনে হইল বালীগঞ্জ ষ্টেশনে পাওয়া সম্ভব। বিনীত ভাবে সে তাহাই জানাইল। মহিলাটি যেন তাহার দিকে একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইয়া আবার মোটর চালাইয়া দিলেন। বিস্মিত তিনি তাহার কথায় না তাহাকে দেখিয়া হইলেন বুঝা গেল না। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইবার কি আছে!

রমেশ একবার নিজের বেশ-ভূষার দিকে তাকাইয়া দেখিল। সুবেশ তাহাকে ঠিক বলা চলে না। সার্টটা কাপড়ের চেয়ে একটু বেশী ময়লা, ঠিক মেলে নাই। বুক পকেটটা নানা আবশ্যক অনাবশ্যক জিনিসের ভারে একটু ঝুলিয়া পড়িয়াছে, একটা কোণ সামান্য একটু ছেঁড়াই হইবে। জুতাটা নতুন কিন্তু ধূলায় মলিন হইয়া আছে। কিন্তু সুবেশ নয় বলিয়া বিস্মিত হইবার কি কারণ থাকিতে পারে ? আর বালীগঞ্জে পেট্রোল পাওয়া যায় বলিয়া অজ্ঞতার পরিচয় যদি সে দিয়াই থাকে তাহাতেই বা লোক অবাক হইবে কেন। নিজেকে পেট্রোল-পাম্প-গাইড বলিয়া সে ত জাহির করে নাই! তবে—

সহসা সব রহস্য পরিষ্কার হইয়া গেল। এই জন্যই বুঝি গোড়া হইতে তাহার চিনি চিনি মনে হইতেছিল। এ ত প্রিসিলা! সেদিনকার ক্ষীণকায়া মেয়েটি গায়ে একটু সারিয়াছে। তখন তাহাকে তন্বী বলিয়া বর্ণনা করিলে শব্দার্থকে একটু বেশী রকম সংকীর্ণ করা হইত। আজ আর তাহা হয় না। রঙটা কেমন করিয়া আর এক পোঁচ ফরসা হইয়াছে বলিয়াই মনে হইল। কণ্ঠ তাহার চিরদিনই মধুর, কিন্তু তাহাতে কেমন যেন একটু গাম্ভীর্যের স্পর্শ লাগিয়াছে।

এতদিন বাদে প্রিসিলাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া তাহার ভালোই লাগিল।

কিন্তু প্রিসিলা টু-সিটার কার পাইল কোথায়? তাহাদের অবস্থা ত সে ভাল করিয়াই জানে। পিতা তাহার রিটায়ার্ড মুন্সেফ। মনে যতখানি সাধ তাহার উপযুক্ত সঙ্গতি নাই। হাইকোর্টের তক্তে বসিবার বাসনা লইয়াও তিনি কোনদিন মুন্সেফির বেড়া পার হইতে পারেন নাই। বালীগঞ্জে বিরাট ভিলার কল্পনা লইয়া ভবানীপুরের গলিতে ভাড়াটে বাড়ীতে দিন কাটাইয়াছেন। রোল্‌সের স্বপ্ন দেখিয়া সামান্য গাড়ী ঘোড়া রাখাও তাঁহার সাধ্যে কুলায় নাই!

তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কোন্ আকাশ স্পর্শ করিতে চাহিয়াছিল কন্যার প্রিসিলা নামটাতেই তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রিসিলা অবশ্য তাহার আদিম নাম নয়। কন্যা হইবার সময় রামসদয়বাবু জজকোর্টের সামান্য উকিল মাত্র। আকাঙ্ক্ষা তখন তাঁহার ধূলির ধরণীতেই বিচরণ করে। কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন—চারুশীলা। তাহার পর অকস্মাৎ অভাবনীয়রূপে একদিন তাঁহার মুন্সেফি জুটিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার আকাশের দিগন্তরেখা অনেকখানি দূরে সরিয়া গেল। মুন্সেফি হইতে জজীয়তি এমন কিছু বেশী দূর নয়—কেহ পূর্বে এ ব্যবধান অতিক্রম করে নাই এমনও নয়। সুতরাং রামসদয়বাবু সস্ত্রীক প্রস্তুত হইতে লাগিলেন—কন্যার নাম সহসা চারুতা পরিহার করিয়া শীলা হইয়া উঠিল, নাম ডাকিবার সময় তিনি তাহাতে আরও কিছু যোগ করিয়া একেবারে প্রিসিলা করিয়া তুলিলেন।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী একবার কটাক্ষ করিয়াই কি কারণে বলা যায় না রামসদয়বাবুকে একেবারে বিস্মৃত হইলেন। রামসদয়বাবুর বয়স বাড়িল কিন্তু মুন্সেফি ঘুচিল না। তিনি তবু হাল ছাড়িলেন না। প্রিসিলা বিলাত ও বালীগঞ্জের ছাঁচে প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাঁহার

সহিত কথাবার্তা কহিয়া লোকে বুঝিল বালীগঞ্জের বিরাট প্রাসাদটাই কেমন করিয়া ভুলক্রমে ভবানীপুরের গলিতে আটক হইয়া গেছে, 'রোলস্' গাড়ীখানা বুঝি সেই কারণেই অন্য রাস্তা দিয়া চলাচল করে।

সুতরাং সেই প্রিসিলার টু-সিটার কার হাঁকাইয়া যাওয়া বেশ একটু বিস্ময়কর। রামসদয়বাবুর স্বপ্ন কি তবে হঠাৎ সফল হইয়া গিয়াছে? কিন্তু কেমন করিয়া? লটারির টিকিটের দ্বারা ছাড়া আর কোন উপায়ই রমেশের মনে হইল না। আর কাহারও ধার করিয়া আনিয়াছে এ কথা আর যাহার সম্বন্ধে হউক প্রিসিলার সম্বন্ধে ভাবা যায় না। রামসদয়বাবুর মেয়ে হইলেও প্রিসিলার মনের ধাত আলাদা। এই কারণে পিতা ও কন্যার মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বড় কম হয় নাই। পিতা তাহাকে যে ছাঁচে যেমন করিয়া ঢালাই করিতে চাহিয়াছিলেন প্রিসিলা বরাবর তাহার অনুমোদন করিয়াছে বলিলেও প্রিসিলার প্রতি অবিচার করা হয়। সে প্রতিবাদ করিয়াছে, বিদ্রোহ করিয়াছে—একবার ত সে বিদ্রোহ প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল। প্রচণ্ড হইয়াছিল তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া।

স্টেশনের দিকে চলিতে চলিতে রমেশের সেই কথাই মনে পড়িতেছিল।

এই প্রিসিলার সহিতই একদিন তাহার জীবন জড়াইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সে তখন কলেজের ভালো ছাত্র—বি. সি-এস্ পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে—ভালো ভাবে যে তাহাতে উত্তীর্ণ হইবে এ বিষয়ে তাহার বা আর কাহারও সন্দেহ ছিল না। এই সময় প্রিসিলাদের বাড়ীর সহিত তাহার আলাপ। মেয়েদের সহিত খোলাখুলিভাবে মিশিবার সুযোগ সাধারণ বাঙালীর ছেলের বড় একটা মেলে না। মিলিলে সে সুযোগ অবহেলা করা শক্ত। রমেশ সে সুযোগ অবহেলা করিতে পারে নাই। রামসদয়বাবুর দৃষ্টি অবশ্য

বিলাতফেরত আই-সি-এসের নীচে কোথাও নিবদ্ধ থাকিবার নয়, তিনি যেন একটু কৃপার চক্ষেই তাহাকে দেখিতেন, কিন্তু প্রিসিলা ও তাহার মা রমেশের প্রতি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

বিবাহের কথাবার্তা প্রায় পাকা হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় পরীক্ষার ফলাফল বাহির হইল। দেখা গেল অভাবনীয় ভাবে রমেশ ফেল হইয়াছে। রামসদয়বাবু বেঁকিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রিসিলাও পিতার বিরুদ্ধে বেঁকিয়া দাঁড়াইল। হয়ত ঝোঁকের মাথায় সেদিন তাহারা একটা কিছু করিয়া বসিত কিন্তু রমেশের মামা দেশ হইতে এই সমস্ত সংবাদ পাইয়া আসিয়া একরকম ছোঁ মারিয়া রমেশকে দেশে লইয়া গিয়া ফেলিলেন। পিসিমা রমেশের 'বেম্মো' মেয়ে বিবাহের কথায় কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিলেন; মা-হারা ছেলেকে তিনিই ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছেন। মামারা ধমকাইল, পাড়াপ্রতিবাসীরা বুঝাইল, ছিছি করিল, এবং একদিন সবাই মিলিয়া যখন তাহাকে ঘটা করিয়া আর এক বিবাহবাসরে লইয়া গিয়া তুলিল, তখন সে আপত্তি করিবার অবসরই বুঝি পাইল না।

তাহার পর লজ্জায় আর সে প্রিসিলাদের সহিত দেখা করে নাই এবং ধীরে ধীরে কবে যে ভুলিয়া গিয়াছে সে কথা তাহার মনেই নাই। আসল কথা প্রিসিলার সহিত বিবাহে তাহার আপত্তি না থাকিলেও উৎসাহ তেমন বোধ হয় বেশি ছিল না।

আজ কিন্তু এই সুশ্রী সুবেশ পরিপাটি মেয়েটিকে দেখিয়া তাহার মনের কোণে কোথায় একটি গোপন বেদনা যেন সাড়া দিয়া উঠিল। যে জীবন লইয়া সে এতদিন সুখেস্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত ভাবে কাটাইতেছিল, তাহার ভিতর কোথায় যেন একটা ফাঁক আজ তাহার কাছে আবিষ্কৃত হইয়া গেল। সে ফাঁক কি এতদিন সে নিজেকে ফাঁকি দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে!

আবার পিছন হইতে একটি মোটরের আওয়াজে রমেশ রাস্তার পাশে সরিয়া যাইতেছিল এমন সময় মোটরটি তাহার কাছে আসিয়াই থামিয়া পড়িল।

প্রিসিলা গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া এবার হাসিয়া বলিল,—"আমাকে চিনতে পারলে না?"

"পেরেছি।"

"তখন তো পারনি। অম্লান বদনে চলে যাচ্ছিলে। আর ফিরে না এলে হয়ত জীবনে কখন দেখা হত না, আমার কিন্তু একটুও দেরী হয়নি।"

"তুমি আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছ—তাছাড়া—" বলিয়া রমেশ চুপ করিল।

প্রিসিলা আগের মত হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"তা ছাড়া আমায় এ ভাবে দেখবে আশা করনি।"

একটু থামিয়া প্রিসিলা আবার বলিল,—"রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন করে কথা কওয়া যায় না—এস না।" গাড়ীর দরজাটা সে খুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"ভয় নেই, সে পুরানো কথা তুলবো না—তুলে কোন লাভও নেই।"

আড়াইটার ট্রেণ আসিতে আর দেরী নাই। এ ট্রেণ না ধরিতে পারিলে কাজের যে ক্ষতি হইবে তাহাও রমেশের মনে পড়িল। কিন্তু এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে সে পারিল না।—"না না, সে কথা ভাবিনি" বলিয়া পোঁটলা ও মাছ লইয়া সে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল!

মোটর আবার চালাইয়া দিয়া প্রিসিলা বলিল,—"খুব সংসারী হয়েছ দেখছি।"

গাড়ীতে উঠিয়া কোথায় পুঁটলি ও মাছ নামাইবে ভাবিয়া না পাইয়া রমেশ একটু আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিল। এই গাড়ীর সঙ্গে

পোঁটলা ও মাছ কিরূপ বেমানান হইতেছে বুঝিয়া লজ্জাও তাহার একটু হইতেছিল—তাহার অবস্থা বুঝিয়া প্রিসিলা বলিল,—"নামিয়ে রাখ না ওগুলো, এই সীটের তলায়।"

গিয়ার বদলাইয়া প্রিসিলা প্রবল বেগে গাড়ী চালাইয়া দিয়াছে। হাতের ভারগুলো নামাইয়া দিয়া রমেশ অনেকটা স্বচ্ছন্দ হইয়া বসিল। হাওয়ার বেগে প্রিসিলার মাথার কাপড়, চুল আঁচল সমস্ত উড়িতেছিল। সে দিকে চাহিয়া রমেশের মন কেমন সংকুচিত হইয়া গেল। এ প্রিসিলার পাশে বসা বুঝি তাহার সাজে না, বসা ধৃষ্টতা, কিন্তু কি ভালোই লাগিতেছে।

যথাসম্ভব কণ্ঠকে সহজ করিয়া সে প্রিসিলার আগেকার কথার খেই টানিয়া বলিল, "সংসারী হয়েছি বলে মনে মনে হাসছ নাকি ?"

প্রিসিলা তাহার দিকে চোখ ফিরাইল। সে চোখে বেদনার ছায়া দেখিয়া রমেশ বিস্মিত হইয়া গেল। প্রিসিলা বলিল,—"হ্যাঁ, আমার হাসবার কথাই বটে !"

এ কথার উত্তর দেওয়া যায় না। সে চেষ্টা রমেশ করিল না।

প্রিসিলাই আবার বলিল,—"একটা আশ্চর্য কথা শুনবে। আজ সারাদিন তোমার কথাই ভাবছিলাম। তাইত তোমায় দেখে নিজের চোখকেই প্রথমতঃ বিশ্বাস করতে পারিনি—দৈবে আমার এতদিন বিশ্বাস ছিল না।"

রমেশ কি বলিতে যাইতেছিল, প্রিসিলা তাহার আগেই বলিল,—"তুমিও অনেক বদলে গেছ। শরীরের আর যত্ন-টত্ন নাও না বুঝি ?"

'না' বলিতে পারিলেই রমেশ খুশী হইত, কিন্তু অত বড় মিথ্যা কেমন করিয়া বলা যায়। শরীর তাহার খারাপ যদি কিছু হইয়া থাকে, যত্নের অভাবে হয় নাই। সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রিসিলা বলিল,—"বাঃ। আমি একাই বুঝি কথা বলব। কি ভাবছ বল দেখি?"

"না, ভাবিনি এমন কিছু।"

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের সহিত দুইটি বিপরীতমুখী গাড়ীর মাঝখান দিয়া পথ করিয়া লইয়া প্রিসিলা বলিল,—"ভাবছ না আবার নিশ্চয়ই কিছু ভাবছ। তোমার কাজের ক্ষতি করিয়ে দিলাম না ত?"

এবার রমেশ মিথ্যা কথা বলিল,—"না, কাজ আর কিসের। কাল ত ছুটি।"

কিন্তু কথাটা রমেশের বর্তমান মনের কাছে একেবারে মিথ্যাও বুঝি নয়। সত্যই তাহার মনে হইতেছিল অকারণে সে অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত নীরস কাজগুলিকে অনাবশ্যক প্রাধান্য দিয়া নিজেকে সকল দিক দিয়া বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। জীবনকে সংসার-যাত্রার একঘেয়ে একান্ত সুলভ সুরে বাঁধিয়া তাহার কোন সম্ভাবনা আর সে রাখে নাই। হয়ত এই জীবনকেই উৎসব-সাজে সাজাইয়া দুরাশার পাল উড়াইয়া নব নব সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া চলিত কিন্তু সে তাহাকে গাধাবোট বানাইয়া একঘাট হইতে আর একঘাটে অতি পরিচিত পথ দিয়া কেবলি আনাগোনা করিয়া ফিরিল।

প্রিসিলার হাতের সুদক্ষ শাসনে মোটর ঝড়ের বেগে ছুটিতেছিল। রমেশের মনে হইল এ যেন তাহারি মুক্তির ছুট্। তাহার মনের বহুদিনের রুদ্ধ আবেগ আজ যেন পথ পাইয়াছে।

মোটরের ভিতর সংকীর্ণ বসিবার জায়গায় প্রিসিলার সহিত ক্ষণে ক্ষণে তাহার ছোঁয়াছুঁয়ি হইয়া যাইতেছিল। সে স্পর্শে সর্বাঙ্গে আনন্দ শিহরণ অনুভব করিতে করিতে রমেশের মনে হইতেছিল—এই ত সঙ্গিনী। পুরুষের গোপন অন্তর এমনি নারীই না কামনা করে! এ নারী চলার পথে খুঁটি গাড়িয়া পুরুষকে তাহার সহিত বাঁধিতে

চায় না। এ নারী পুরুষের পায়ে শৃঙ্খল দিতে চায় না, নূতন গতিবেগ দেয়। প্রিসিলার মোটর চালনা হইতেই অলক্ষ্যে এ কল্পনা তাহার মনে আসিয়াছে কিনা অত কথা রমেশ অবশ্য ভাবিয়া দেখে নাই।

যাদবপুর ছাড়াইয়া পল্লী-প্রান্তরের ভিতর দিয়া মোটর তখন চলিতেছে। স্টিয়ারিং হুইলে একটি হাত আলগা ভাবে রাখিয়া প্রিসিলা বলিল—"এখন যদি একটা accident হয়!"

রমেশ তাহার দিকে হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'হোক'!

প্রিসিলা সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, 'আমিও বলি, হোক। মোটরটা ধর যদি পাশের খানার মধ্যে গড়িয়ে ডিগবাজি খেয়ে আমাদের মাঠের ওপর আছড়ে ফেলে, মন্দ কি হয়। খানিক-ক্ষণের জন্যে চোখ বুজবো, তারপরেই হয়ত চোখ খুলে দেখব পাহাড়ের দেশে এসে জন্মেছি—চারিধারে কালো পাহাড় আর সাদা বরফ আর তার মাঝে ছোট্ট পাথুরে গাঁ। গাঁয়ের পাশে উপত্যকায় জনার ক্ষেত, সেখানে তুমি বর্শা নিয়ে পাহারা দাও আর আমি ছোট একটি ঘরে বুনো কাঠের আগুনে তোমার খাবার তৈরী করি।"—প্রিসিলা হাসিয়া উঠিল।

কথাগুলো খচ্ করিয়া কোথায় যে বিঁধিল রমেশ বুঝিতে পারিল না। সাদা বরফ ও কালো পাহাড়ের দেশের উপত্যকায় জনার হয় কিনা তাহাও সে ঠিক জানে না। কিন্তু একটি জিনিস তাহার ভারী আশ্চর্য ঠেকিল। খানিক চুপ করিয়া সে বলিল;—"কিন্তু তুমি অমনি জীবন চাও প্রিসিলা?"

"চাই না আবার! এই জীবন আমার ভালো লাগে মনে করছ? পায়ে আলতা পরে মাথায় ঘোমটা টেনে একটি অত্যন্ত ছোট অপরিসর বাড়ীর মধ্যে সংসারের নানা তুচ্ছ কাজে ঘুরে বেড়াবার জন্যে আমার সমস্ত মন লালায়িত হয়ে আছে জান!"

রমেশ তাহা জানিত না। সহসা তাহার মনে হইল সব উৎসাহ তাহার কখন যেন উবিয়া গিয়াছে। কথাগুলি এবারেও তাহার কানে কেন যে লাগিল সে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু প্রিসিলার মনের এই অদ্ভুত কামনার একটু ইতিহাস আছে। সেটুকু জানাইবার জন্য গল্প ও মোটরের গতিরোধ করিয়া একটু পিছনে ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন।

সকাল বেলাই স্বামীর সঙ্গে তাহার তুমুল ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। সকল প্রকার দৈহিক আস্ফালন বাদ দিয়া চায়ের টেবিলের তুইধার হইতে চাকর বাকর শুনিতে না পায় এমন অনুচ্চকণ্ঠে হইলেও তাহাকে তুমুল ঝগড়া ছাড়া আর কিছু বলিতে পারা যায় না। এই ঝগড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রিসিলা হঠাৎ তুই বৎসরের বিবাহিত জীবনের পরে উপলব্ধি করিয়া ফেলিয়াছে যে পিতার মুখ চাহিয়া সম্ভ্রান্ত সমৃদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বামীর গলায় মাল্য দিয়া সে নিজের জীবন ব্যর্থ করিয়াছে! তাহার পিতার সারাজীবনের সাধ শেষ পর্যন্ত কন্যার মধ্য দিয়া বালীগঞ্জের ভিলা, দামী মোটর ও বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টারে চরিতার্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার হৃদয় এ সমস্ত নকল জৌলুস জয় করিতে পারে নাই। বিলাতী সোনার মত এ জীবনে যত পালিস তত বেশী খাদ—এ জীবন সে ঘৃণা করে। অন্ততঃ আজ সকালে সেই রকমই তাহার মনে হইয়াছে।

ঝগড়ার কারণ সামান্য নয়। সকালে চায়ের জন্য নীচে নামিয়া আসিতে আসিতে মাঝপথে প্রিসিলা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। হল ঘরের একধারে তাহাদের নূতন পরিচারিকা সংকুচিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহার স্বামী তাহার গাল টিপিয়া দিয়া আদর করিতেছে। প্রিসিলাকে দেখিতে পাইয়া বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত

না হইয়া স্বামী বলিল—Caught red-handed, Eh? Well I am going to invent some fine excuses. Don't worry.

চায়ের টেবিলে বসিয়া কিছুক্ষণ কেহ কোন কথা বলে নাই। প্রিসিলা গুম হইয়া বসিয়াছিল। চায়ের কাপ সামনে ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। সুবিকাশ খানিক বাদে বলিল—"আমার ওপর রাগ করে চায়ের কাপটার ওপর নিষ্ঠুর হওয়া উচিত হচ্ছে না। It is pining for your lips."

প্রিসিলা তবু কোন কথা বলিল না। সুবিকাশ নিজের পাত্র নিঃশেষ করিয়া বলিল—'দেবী প্রসন্ন হউন, ভক্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত। কাল বেড়াতে যেতে চাইছিলে; দুর্গম গিরিশিখরে চল তোমায় নিয়ে কৃচ্ছ্র সাধনা করব। নৈনিতাল না মুসৌরী?"

এবার প্রিসিলা চাপা তীক্ষ্ণ গলায় বলিল,—"তোমার কি লজ্জাও নেই।"

'লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ।'

"Don't make idiotic remarks."

"Alright, here's a bright one. You ought to have been named Prudence.

প্রিসিলা স্বামীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"চুপ কর, তোমার ন্যাকামি আমার অসহ্য।"

সুবিকাশ মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল—"On second thought I want to abbreviate that."

এবার আর প্রিসিলা নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল—"চুপ করো, আর কত অপমান তুমি আমায় করবে?"

সুবিকাশ গম্ভীর হইয়া বলি—"বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু দেখ সেট্‌টা না ভাঙ্গে—They are real porcelain."

"No, they are not. They are only cheap imitations as you are." বলিয়া রাগে ক্ষোভে দুঃখে চোখের জল কোন রকমে সংবরণ করিয়া প্রিসিলা বাহির হইয়া গিয়াছিল।

সব চেয়ে তাহার খারাপ লাগে স্বামীর এই অবিচলিত ভাব। কোন অবস্থাতেই সুবিকাশ হার মানিতে চায় না। স্বামী একবার ছোট হইয়া তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সে এ অপরাধও মার্জনা করিতে হয়ত পারিত। সুবিকাশের স্বভাবই তা নয়।

কিন্তু এ স্বভাবের ব্যতিক্রম বুঝি একবার দেখা গেল। প্রিসিলা রাগে বাহির হইয়া গিয়া সোফারকে গ্যারেজ হইতে টু-সিটারটা বাহিব করিতে বলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সুবিকাশ ধীরে ধীরে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না প্রিসিলা?"

"বাড়াবাড়ি কার?"

"Well, forgive and forget."

ক্ষণেকের জন্য প্রিসিলার মনে হইল এ গলার স্বরে যেন স্বামীব অভ্যস্ত আধাব্যঙ্গের সুর নাই। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া তাহার ভ্রম ঘুচিল—সুবিকাশ হাসিতেছে। হাসিয়া আবার সে বলিল—"We poor weak men, you must not be too hard on our lapses."

সোফার তখন গাড়ী বাহির করিয়াছে। কোন কথা না বলিয়া প্রিসিলা তাহাতে উঠিয়া বসিয়া গাড়ী চালাইয়া দিল, যাইবার সময় শুনিতে পাইল সুবিকাশ গলা চড়াইয়া বলিতেছে—"Anyhow, let not the sun go down on your wrath."

তার পর সারা দুপুর প্রিসিলা উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে—তাহাতেও তাহার মনের জ্বালা একেবারে শান্ত হয়

নাই। তাহারই ঝাঁজ রমেশের সহিত তাহার সকল কথায় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

কিছুক্ষণ—কেহই কোন কথা বলে নাই। মোটরের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। বিকাল হইয়া আসিতেছিল। রমেশ বলিল—"আর কতদূর যাবে?"

প্রিসিলা বলিল,—"কেন চল না! যতদূর যাওয়া যায়। মনে হচ্ছে এমনি করে যদি এই জীবনটাকেও পেছনে ফেলে কোন নতুন পথে পার হয়ে যাওয়া যেত!

রমেশ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল,—"তা যায় না।"

"কেন যায় না? মোটরের পেট্রোল হয়ত ফুরিয়ে যায় কিন্তু মানুষের মনও পেট্রোলের তোয়াক্কা রাখে কি?"

ইহার উপর রমেশ কি বলিত বলা যায় না। হঠাৎ একটা বিভ্রাট ঘটিয়া গেল। রমেশের তরকারির পুঁটলির গেরো বোধ হয় শক্ত ছিল না। এতক্ষণ মোটরের ঝাঁকুনিতে আলগা হইয়া হঠাৎ তাহা খুলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেগুন আলু পটল কপি চারিধারে ছড়াইয়া পড়িল।

নীচু হইয়া রমেশ সেগুলি জড় করিয়া বাঁধিবার চেষ্টায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া উঠিল। আলু বেগুন চারিধারে গড়াইয়া গেছে, ধরিতে গেলে মোটরের ঝাঁকুনিতে ফস্কাইয়া যায়। অপরিসর স্থানের মধ্যে নীচু হইয়া খোঁজা অত্যন্ত কষ্টকর, ইহার উপর হঠাৎ অপর দিকের একটি গরুর গাড়ীকে পাশ কাটাইবার জন্য মোটরের বেগ কমাইতে রমেশের মাথাটা ঠক্ করিয়া স্পিডোমিটারের কাঁচে ঠুকিয়া গেল।

"How awkward you are!"

মাথার আঘাতের পর এ কথায় রমেশ হঠাৎ চমকিয়া উঠিল।

মেয়ে মানুষের মুখে ইংরাজী শুনিবার অভ্যাস তাহার অনেক দিন নাই—তাহার উপর সে ইংরাজী উক্তি আবার ব্যক্তিগত সমলোচনা। মাথা নীচু অবস্থাতেই বলিল—"কি করব—তরকারিগুলো জড় করতে পারছি না যে!"

—"তার জন্যে এখনি ব্যস্ত হবারই বা দরকার কি! গাড়ির দরজা বন্ধ, পড়ে ত আর যাবে না। পরে কুড়িয়ে নিলেই চলবে।"

কথাটা ঠিক! সামান্য তরকারির জন্য হঠাৎ অমন ব্যস্ততা দেখান ঠিক হয় নাই। রমেশ লজ্জিত হইয়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু মেয়ে মানুষের কাছে লজ্জা পাওয়াটা সুখকর অনুভূতি নয়। প্রিসিলার উপর অকারণে তাহার মনে একটু অসন্তোষ কোথা হইতে আসিয়া জমিয়াছে সে বুঝিতে পারিল না!

প্রিসিলার মনে মনে হাসি পাইতেছিল। রমেশ সত্যই যে একটু awkward এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই। এখন যেন বেশী করিয়া সব চোখে পড়িল। দাড়িগুলা তাহার অন্ততঃ দুই দিন কামান হয় নাই, মাথার চুলে এত তেল দিয়াছে যে, কপালটা পর্যন্ত তেল চক্‌চকে হইয়া উঠিয়াছে। পায়ের কাছে কাপড়টা ধূলায় অত্যন্ত মলিন। সার্টের পকেটে কি রাজ্যের যত জিনিস বোঝাই করিয়া সেখানটা অশোভন ভাবে উঁচু না করিয়া রাখিলে চলিত না? এতকাল রমেশ ত বেশ ভালোই কথা বলিতে পারিত। কিন্তু প্রিসিলার মনে পড়িল, এতক্ষণ তাহাদের দীর্ঘ আলাপের মধ্যে বাক্‌পটুত্বের পরিচয় রমেশ বিশেষ দিয়াছে বলা যায় না। এই কয়েক বৎসরে রমেশ যেন কেমন জবুথবু হইয়া পড়িয়াছে।

রমেশ বলিল—"এবার ফেরা যাক্।"

"আর যাবে না?"

রমেশ বলিল, "না থাক্।"

প্রিসিলা আর আপত্তি করিল না। সুবিধামত এক জায়গায় গাড়ীর মোড় ফিরাইয়া লইল।

আবার দুই পাশের প্রান্তরের ভিতর দিয়া অনতিপ্রশস্ত ধূলি-ধূসর পথ পার হইয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। প্রিসিলা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"কিন্তু How lovely !"

"কি ?"

"এই ধানের ক্ষেত। কবিরা অনেক জিনিসের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ঘ্যানর ঘ্যানর করে একেবারে তাকে পচিয়ে ফেলেছে কিন্তু এর রূপের বোধ হয় এখনও নাগালই পায়নি।"

রমেশ এ উচ্ছ্বাসে সায় না দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, কিন্তু Lovely ত নয়। এবারে ত মাঠের চেহারা দেখলে কান্না আসে। ভাল করে বৃষ্টি না পেয়ে গাছগুলো ত বাড়তেই পায়নি।"

একটু যেন অসহিষ্ণু ভাবে প্রিসিলা বলিল—"তাই নাকি ! আমি agriculture-expert ত নই। বাইরে থেকে যেমন দেখছি তেমনি বললাম।"

রমেশ শুধু 'ও' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

প্রিসিলা খানিক বাদেই কিন্তু আবার বলিল, "এই গ্রে মাটির ওপর নীল আকাশের সঙ্গে ধানের ক্ষেতের সবুজ রঙ—কি combination ! মঙ্গল গ্রহের vegetation নাকি লাল রঙের। বিধাতার তখনও বোধ হয় হাত কাঁচা, artistic sense ভালো করে develop করেনি। আমাদের পৃথিবীতে সবুজের বদলে বিধাতা অন্য একটা রঙ choose করলে কি বিপদ হত বলত ?" কথাগুলো খট্ খট্ করিয়া এবারেও রমেশের কানে লাগিল। কিন্তু কেন যে লাগিল এবারে তাহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না। এ যে নিছক ন্যাকামি ! ইহার উত্তরে গম্ভীর হইয়া সে শুধু বলিল—"অত ভেবে দেখিনি।"

তাহার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রিসিলা বলিল "ও"।

রমেশ সম্বন্ধে তাহার মত অনেকখানি ইতিমধ্যে বদলাইতে হইয়াছে—রমেশ শুধু awkward নয়, অত্যন্ত dull। তাহার স্বামীকে আর যাহাই হোক dull বলা যায় না। চারিদিকে সারাক্ষণ তাহার জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। বুদ্ধিতে প্রাণের প্রাচুর্যে তাহার তুলনা কোথায়? হ্যাঁ অন্যায় সে করিয়াছে বটে কিন্তু ক্ষমা চাহে নাই এমন কথাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? তাহার ক্ষমা চাহিবার ধরনই ওই রকম।

রমেশ গাড়ীর 'সীটে' হেলান দিয়া যাহা ভাবিতেছিল তাহাকেও ঠিক প্রিসিলার প্রশস্তি বোধ হয় বলা যায় না। তাহার মনে হইতেছিল সে-বার মামা তাহাকে দেশে ধরিয়া লইয়া গিয়া কি উপকারই করিয়াছিলেন। এই পটের বিবির মত মেয়েটির সহিত দিনের পর দিন এই ন্যাকামি শুনিতে শুনিতে কাটাইতে হইলেই হইয়াছিল আর কি? প্রিসিলার যে মুখ সারাদিনের ঘোরা-ফেরায়, অনাহারে শুকাইয়া আসিয়াছিল তাহাকেই অত্যন্ত রূঢ় ভাবে বিচার করিয়া সে ভাবিতেছিল,—ইহাদের রূপ ত থাকে বিলিতী পাউডার পমেটমের কৌটায় আর ইহাদের মন বিলিতী বইএর পাতায়; সারা জীবনটাই ইহাদের নকল। কেমন করিয়া ইহাকে প্রথমে তাহার ভালো লাগিয়াছিল তাহাই সে ভাবিয়া পাইল না। যাই হোক, সে খুব বাঁচিয়া গিয়াছে। তবে আজকের দুপুরটা তাহার বৃথাই গেল। ছাগলটা হয় ত ফস্কাইবে, চালাঘরের কাজ কালও আরম্ভ হইবে না।

রমেশকে বালীগঞ্জে নামাইয়া দিয়া প্রিসিলা যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন তাহাদের লনে টেনিস খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে। রমেশ নামিয়া যাইবার সময় তাহার আলু পটল বেগুন কুড়াইতে গিয়া যে

হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল তাহাতে তাহার বিরক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই। অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখে হলের ভিতর ঢুকিতে ঢুকিতে প্রিসিলা দেখিল সুবিকাশ টেনিস স্যুট পরিয়া র‍্যাকেট হাতে নামিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সুবিকাশ অপরূপ ভঙ্গি করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "তারপর রাগের চোটে তোমার ও-রথচক্রতলে কতগুলি নিরপরাধ পথিকের প্রাণসংহার করে এলে দেবী? কলিকাতা শহরে গ্যাসের বাতি দেবার মত নাগরিক আর অবশিষ্ট আছে ত?"

প্রিসিলা এবার না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সুবিকাশকে টেনিস স্যুট চমৎকার মানাইয়াছে,—পরিচ্ছন্ন সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল দু'টি চোখ। সেদিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে বলিল, "কেন, আমায় কি আনাড়ি ভাব নাকি?"

"তোমায় যা ভাবি তা বলবার ভরসা পেলাম কই?"

"আচ্ছা ভরসা দেব এখন একটু দাঁড়াও, আমি যাহোক কিছু খেয়ে নিয়েই আসছি। মনে থাকে যেন তুমি আমার partner."

সুবিকাশ সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"Until death do us part."

রমেশ যখন বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অঞ্চল-আড়ালে কম্পিত দীপ-শিখাটি লইয়া অবগুণ্ঠিতা অনুপমা তখন তুলসী প্রণাম করিতে চলিয়াছে বলিতে পারিলেই সুখী হইতাম। কিন্তু বলিবার যো নাই। পিসিমার দৃষ্টি এড়াইয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল, ভাঁড়ার ঘরের পাশে ডিবিয়ার আলোয় অনুপমা উনানের জন্য কয়লা ভাঙিতেছে! হাতে তাহার কালি লাগিয়াছে, মুখেও বাদ পড়ে নাই। তবু মুগ্ধ রমেশের মনে হইল নারীর এমন কল্যাণী মূর্তি সে কখনও দেখে নাই। পুরুষের পরগাছা নয়, এই ত চিরন্তন নারী! যুগে যুগে সত্যকার রক্ত মাংসের পুরুষ ইহাদেরই প্রেমে ধন্য হইয়াছে।

মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।

এমন ঝগড়া তাহাদের অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু আজ যে কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল, এমনটি তাহারা নিজেরাও আশা করে নাই। নিজেদের ঝগড়ার পরিণাম দেখিয়া তাহারা নিজেরাই বুঝি বিস্মিত ভীত হইয়া গিয়াছিল।

অথর্ব পঙ্গু পায়ের পটি খুলিতে খুলিতে বুড়ী মা বোধ হয় সেই কথাই ভাবিতেছিল। কোথা হইতে কি যেন হইয়া গেল। কটু কথা বলিয়া কন্যাকে আঘাত করিতে গিয়া এমন কথা যে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে, একথা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু অশান্ত জিহ্বা সকল সময়ে রাশ মানে না।

কথাটা শুনিলও সবাই।

দেয়ালের ও-পিঠের বাঙ্গাল-বৌ মুখখানা বিকৃত করিয়া কিছু না বলিয়াও যাহা জানাইয়া গেল তাহার বিষ বড় কম নয়।

দক্ষিণের চালায় ভাড়াটিয়া কমলির মা ত স্পষ্টই বলিয়া গেল, এমন জানিলে কোন্ গেরস্ত এই পাপের পুরীতে ঘরভাড়া করিত?

চক্ষুলজ্জা যাহাদের একেবারে যায় নাই তাহারা সামনে আসে নাই এবং স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে নাই বটে, কিন্তু দেওয়ালের ও-পিঠে যে পরম রসাল বৈঠক জমিয়াছিল তাহার নাতিমৃদু গুঞ্জন হইতে এটুকু অন্ততঃ বুঝিতে পারা যাইতেছিল যে, আর যাহাই হউক জিহ্বার ধার তাহাদের কম নয়।

কিন্তু সেদিকে বৃদ্ধার কান ছিল না। দরমার দরজাটি খুলিবার শব্দের আশাতেই কান পাতিয়া উৎসুক হইয়া সে বসিয়া ছিল। সেই

সকালে ঝগড়ার মাঝে অতি কুৎসিত একটি অপবাদ শুনিয়া জবাব না দিয়া মানদা যে বাহির হইয়া গিয়াছে বেলা তিন পহর হইয়া গেলেও সে এখনও ফিরে নাই।

পায়ের পটি খুলিতে খুলিতে মান্নুর মা থামিল। আগড়ের দরজা ঠেলিয়া কে যেন প্রবেশ করিল।

কিন্তু সে মানদা নয়, জমিদার-গিন্নী।

জমিদার-গিন্নীর বয়স হইয়াছে, শখটুকু মরে নাই। চওড়া লাল কস্তাপাড় শাড়ীও পরে, সাদাচুলে চঙ্ করিয়া খোঁপাও বাঁধে। রকের পাশেই এক ধাবড়া পিচ ফেলিয়া রকের উপর সে খুঁটি ঠেসান দিয়া বেশ ভাল করিয়া বসিয়া বলিল, "আসবার কি আর সময় পাই। সাত সতেরো লেগেই আছে। এই দু'পহর বেলায় দু'টো ভাতজল মুখে পড়ল। তা তোমাদের কি রান্না হল গো?"

মান্নুর মা কথা কহিল না।

অনেকগুলো কথা এক সঙ্গে বলিয়া ফেলিয়া জমিদার-গিন্নীর হাঁপ লাগিয়াছিল। দম লইয়া সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কইগো দিদিমণি কোথা?"

মান্নুর মাকে এবার বলিতেই হইল—"কোথায় বেরিয়েছে।"

"ওমা, এই এত বেলায় না খেয়ে বেরিয়েছে!"

মানদা খাইয়া বাহির হইয়াছে কি না জমিদার-গিন্নীর জানিবার কথা নয়, কিন্তু সে কথা তাহাকে বলা চলে না। তাহার এই অযাচিত আত্মীয়তার কোন জবাবই খুঁজিয়া না পাইয়া মান্নুর মা নীরবে পায়ের পটি খুলিতে লাগিল।

জমিদার-গিন্নীর গলা পাইয়া ও-পিঠের বৈঠক ইতিমধ্যেই ভাঙ্গিয়াছিল। এক এক করিয়া সবাই রকের ধারে ভিড় করিয়া আসিয়া বসিল। জমিদার-গিন্নী রগড় বাধাইতে জানে বলিয়া

তাহার একটি বিশেষ খ্যাতি আছে। শুধু যা উস্কাইয়া দিবার প্রয়োজন।

বাঙ্গাল-বৌ সে কাজটা পারে ভাল। দীর্ঘ পুরুষালি ছাঁদের শ্রীহীন দেহ। লম্বা কুৎসিত চোয়াল-ওঠা মুখে লম্বা পানের-ছোপে কালো-মাড়ি সমেত দাঁতগুলি তাহার বাহির হইয়াই থাকে। দাঁতগুলি আর একটু উঁচাইয়া সে বলিল, "বেশ ছিলাম মা এখানে, তোমাদের পাড়ায়। আবার কোথায় যাব—কেমন পাড়াপড়শী হবে কে জানে।"

বেশই সে ছিল বটে। তাহাদের স্বামী-স্ত্রীর গালাগালি ঝগড়া মারামারিতে উত্যক্ত অতিষ্ঠ হইয়া আগের দিনই পাড়ার লোকে তাহাদের হাত জোড় করিয়া এ-পাড়া ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু সে কথা তুলিবার সময় এখন নয়।

জমিদার-গিন্নী সবিস্ময়ে বলিল,—"সে কি! যাবি আবার কোথায়? মানদা কি উঠিয়ে দিলে নাকি?"

বাঙ্গাল-বৌ জ্বলিয়া উঠিল, "উঠিয়ে দেবে! মাগনা না কি?" এবং পরমুহূর্তেই অপরূপ কৌশলে কণ্ঠস্বরকে একেবারে কোমলে নামাইয়া আনিয়া হতাশভাবে বলিল, "কিন্তু তা বলে আমি ত আর এখানে থাকতে পারি না মা!"

ভনিতাটা ভাল করিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল—ব্যাপারটিকে পাকাইয়া ঘুরাইয়া ফেনাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া উপভোগ করা যাইবে বুঝিয়া বোধ হয় সকলেই উল্লসিত হইয়া উঠিল।

আকাশ হইতে পড়িয়া জমিদার-গিন্নী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"না মা, ভাগ্যি-দোষে না হয় গরীবই হয়েছি, তা বলে মান-সম্ভ্রম ত আছে, সোয়ামী পুত্তুর নিয়ে ঘর ত করি—অকল্যাণ হবে যে মা!"

"কি যে তোরা বলিস্ বাপু মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না—বল না

মান্নুর মা, এ-কথায় মাথামুণ্ডু কিছু পেলে?" জমিদার-গিন্নী চোখ টিপিল।

হাসিল সবাই এবং সবচেয়ে বেশী হাসিল বেনেদের সোহাগী বলিয়া মেয়েটা। সমর্থ যুবতী মেয়ে; বছর খানেক আগে স্বামী তাহাকে কি কারণে বলা যায় না ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ করিয়াছে। বিবাহ করার পূর্বে এই মানদাই সোহাগীর হইয়া তাহার স্বামীকে বুঝাইবার জন্য কি অক্লান্তভাবে টানা পড়েন করিয়া পায়ের সুতা ছিঁড়িয়াছিল সে কথা এখনও অনেকের মনে ছিল। এত হাসি জমিদার-গিন্নীরও যেন ভাল লাগিল না, "অত হাসি কিসের লা? ফচ্‌কে ছুঁড়ি!"

সোহাগী চোট্‌পাট জবাব দিল, "হাসির কথা তা হাসব না? ফচ্‌কে ছুঁড়ি বোলো না বলে দিচ্ছি।"

এত কষ্টের আয়োজন বুঝি মাঝপথেই পণ্ড হয়! জমিদার-গিন্নীর উদ্যত জবাবটিকে কোন প্রকারে ঠেকাইয়া বাঙ্গাল-বৌ তাড়াতাড়ি বলিল,—"আহা মা, ছেলেমানুষ, ওর কথা কি আর ধর্তব্য। আর ওরই বা দোষ কি? যেমন দেখছে তেমনি ত হবে।"

কথাটা ঘুরাইয়া মন্দ বলা হয় নাই। আর এমন সুযোগ হেলায় হারান জমিদার-গিন্নীরও ইচ্ছা নয়। সোহাগীকে সায়েস্তা না হয় পরে করিলেও চলিবে।

জমিদার-গিন্নী বলিল—"আচ্ছা যাক্, কিন্তু তোর হেঁয়ালিও কিছু বুঝলাম না ত। স্বামী পুত্রের অকল্যাণ, মান-সম্ভ্রম—ও সব কি কথা!"

বাঙ্গাল-বৌ আশ্বস্ত হইয়া গুছাইয়া বসিয়া বলিল, "কথা আর কি মা; ওই ত মান্নুর মা বসে আছে, ওকেই না হয় জিজ্ঞেস কর না।"

মান্নুর মা কাতরভাবে এতক্ষণ ইহাদের মুখের দিকে নির্বোধের মত চাহিয়াছিল, এইবার মাথা নীচু করিল।

"বল না মান্নুর মা, তুমিই না হয় বল।"

মান্নুর মার পরিবর্তে সোহাগীই জবাব দিল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "বলেছে ত একবারঃ আবার কবার করে বলতে হয়। নিজের মেয়ে বেশ্চে, সে কথা কি ঢাক পিটে বেড়াবে নাকি ?"

ঠিক সেই সময় দরমার আগড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিয়া ইহাদের দেখিয়া কাঠের মূর্তির মত যে দাঁড়াইয়া পড়িল, সে মানদা।

সব চেয়ে আশ্চর্য এই যে, এতক্ষণ যাহারা আস্ফালন করিতেছিল, এক সঙ্গে তাহাদের মাথাই যেন অকারণ লজ্জায় নত হইয়া পড়িল। কাহারও মুখে আর কথা নাই।

শুধু জমিদার-গিন্নী অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এই যে, এস দিদিমণি।"

মানদার সামনে সত্যই মুখ তুলিয়া জোর গলায় কিছু বলিতে পাবে এমন লোক বিরল। এক একজনের কাছে সত্যই অকারণে এমনি সঙ্কোচ হয়।

কালো দশাসই সুবিশাল চেহারা। ভয়াবহ কিছু না থাকিলেও এমন একটি সুদূর প্রশান্ত গাম্ভীর্য সে মুখে আছে যে মাথা আপনা হইতেই নীচু হইয়া আসে। মানুষের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্যই বিধাতা এক এক জনকে যেন এমনি করিয়া গড়েন। অপ্রতিহত প্রভাবের জন্য তাহাদের সাধনা করিতে হয় না, যেখানে তাহারা গিয়া দাঁড়ায় সেখানে আপনা হইতে মানুষের মন আজ্ঞা পালনের জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়।

পাড়ার লোকে এতদিন বলিয়া আসিয়াছে, "দিদিমণি একাই একশ"। পুরুষ হইলে দিদিমণি জজ না ম্যাজিষ্টের হইত এই লইয়া পাড়ার মেয়ে-মহলে অনেক জল্পনা কল্পনা হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ

মুখুজ্যে মশাই সব জায়গায় বলিয়া বেড়ান—"এ-পাড়ায় পুরুষ আছে ত একটি—ওই মানদা।" সুখে দুঃখে আনন্দে উৎসবে দিদিমণি অনায়াসে নিজের স্কন্ধে সকল দায় তুলিয়া লয়—তাহাকে ডাকিবার কথা লোকের আর মনেও পড়ে না।

বয়স তাহার যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বের তীরে গিয়া ঠেকিয়াছে। যৌবনে সে দেহ বোধ হয় কুৎসিতই ছিল। নারীত্বের মাধুর্য হইতে বঞ্চিত করিয়া বিধাতা তাহাকে সংসারে শুধু শাসনের ক্ষমতা দিয়াই পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার যৌবনের কথা মানুষের মনে পড়ে না। তাহার ইতিহাস কেহ জানে না, জানিবার কথা কাহার মনেও আসে না। দিদিমণি রূপেই সে সম্পূর্ণ।

দশ বৎসর আগে পঙ্গু মাকে লইয়া এ-পাড়ায় আসিয়া জমিদারের কাছে চার কাঠা জমি ইজারা লইয়া এই চালা ক'টি সে বাঁধিয়াছিল। ইহার দুটিতে সে নিজে বৃদ্ধা মাকে লইয়া থাকে, অপরগুলি ভাড়ায় খাটাইয়া আয় তাহার মন্দ হয় না। আত্মীয়-স্বজন কেহ কোথাও নাই। তাহার সিঁথির সিন্দুর ও হাতের নোয়া দেখিয়া তাহার স্বামী যে আছে, এই পরিচয়টুকু শুধু লোকে পাইয়াছে, আর কিছু এ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার সাহস বা প্রবৃত্তি কাহারও হয় নাই।

যা কিছু অসুবিধা অস্বস্তি মানদার ওই বৃদ্ধা মাকে লইয়া। মা-টি শুধু অথর্ব পঙ্গু নয়, একেবারে নির্বোধ। এই নির্বুদ্ধিতার ফলে মানদাকে ভুগিতে হয় বড় বেশী।

বাতে পঙ্গু পা লইয়া মানুর মা সাধারণতঃ উঠিতে পারে না। কিন্তু পারিলে আর রক্ষা নাই। লাঠি বগলদাবায় করিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সারাদিন পাড়া বেড়াইয়া সে যে গোলটি বাধাইয়া আসে, তাহার জের পরের দিন অবশ্যম্ভাবী ঝগড়ার মধ্যে অনেক কষ্টে মেটে।

মানদা বলে, "তোমার জ্বালায় কি আমি গলায় দড়ি দেব? তোমায় ত্রিশ দিন বলেছি না যে, ঘর থেকে তুমি বেরিও না।"

মান্নুর মা নির্বোধের মত চীৎকার করে, "ওরে বাবারে! কেন? বেরুবো না কেন শুনি? পেটের মেয়ে তুই, দশমাস দশদিন তোকে গর্ভে ধরেছি, তুই হুকুম করবি আর আমার তাই শুনতে হবে। তোর দু'টো খাই বলে?" এ কেলেঙ্কারী মানদার অসহ্য লাগে; বলে,—"বেরুতে ত বারণ করি না, মুখ বুজে থাকতে পার না কেন? তোমাব জন্যে যে আমার মাথা কাটা যায়।"

মান্নুর মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সপ্তমে তুলিয়া বলে, "ওরে বাবারে! আমার জন্যে তোর মাথা কাটা যায়! তুই না হয় মদ্দানী হয়েছিস্ লো, সভায় গিয়ে বক্তিতে দিতে পারিস, তাই বলে আর সবাই মুখ বুঁজে থাকবে নাকি? আমরা আর মানুষ না, আমরা আর কথা কইতে পারি না?"

মানদা আর সহ্য করিতে না পারিয়া ধমক দিয়া বলে, "এবার যদি বাড়ী থেকে বেরোও ত আর ফিরো না।"

বৃদ্ধার ক্রোধ এবার কান্না হইয়া বাহির হয়। কবে পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে তাহার একটি শিশুপুত্র দুই মাসের হইয়া মারা গিয়াছিল: সে বাঁচিয়া থাকিলে আজ কত বড় লোক হইত ও তাহাকে এমন করিয়া দু'টি ভাতের জন্য কাহারও মুখনাড়া খাইতে হইত না, সেই কথা বিনাইয়া বিনাইয়া সে কাঁদিতে সুরু করে।

অবশেষে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মানদা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়।

কিন্তু বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হয় না। কয়েকদিন বাদেই লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে বৃদ্ধা পাড়ায় বাহির হইয়া সবিস্তারে

বলিয়া আসে, তাহার মেয়ের ঘড়া ঘড়া টাকা তাহাদের ঘরের মেঝেতে পোঁতা আছে, অথবা এককালে মানদা নাকি স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরুণের মত সুন্দরী ছিল, একবার দেখিলে আর চোখ ফিরান যাইত না, শুধু রোগে শোকে আর অবহেলায় অযত্নেই তাহার এমন ছিরি হইয়াছে।

যেমন করিয়াই হউক একথা মানদার কানে পৌঁছায় ও পরের দিন আবার নির্বোধ মাকে কিছুতেই বুঝাইতে না পারিয়া তাহাকে অবশেষে ঘর ছাড়িয়া যাইতে হয়।

সেদিন, মায়ের এমনি একটি নিবু‍্দ্ধিতা লইয়া ঝগড়া বাধে।

মান্নুর মা পাড়ায় বাহির হইয়া, তাহার মেয়ের কোন রাজবাড়ীতে কি সমারোহে বিবাহ হইয়াছিল ও সেই রাজপুত্র স্বামী তাহার মেয়ের জন্য এখন পর্যন্ত পাগল হইয়া লইয়া যাইবার জন্য সাধাসাধি করা সত্ত্বেও মানদা শুধু দুর্দান্ত শাশুড়ীর জ্বালাতেই সেখানে কেন যাইতে চাহে না, এই কাহিনী সবিস্তারে বলিয়া আসিয়াছিল। এমন কি সেই রাজপুত্র জামাই এবার গোপনে মানদাকে সাধিতে আসিলে লুকাইয়া সে দেখাইয়া দিবে বলিয়াও দু একজনকে আশ্বাস দিতে ভোলে নাই।

মূঢ়তার এই চরম পরিচয়ে মানদা এবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াই একটু অতিরিক্ত কটু কণ্ঠে মাকে আসিয়া বলিয়াছিল, "হয় তুমি বাড়ী থেকে বেরোও, নয় আমি বেরিয়ে যাই।"

নিজের কল্পনার অতখানি উচ্ছৃঙ্খলতায় মান্নুর-মা নিজেই বোধ হয় এবার একটু লজ্জিত হইয়াছিল। এবং লজ্জিত হইয়াছিল বলিয়াই সে দ্বিগুণ জোরে ঝগড়া করিল।

মানদা তিক্ত কণ্ঠে বলিল, "জীবনভোর সুখ ভোগ করেও হয়নি, আবার রাজার শাশুড়ী হতে সাধ গেছে? ছিঃ, লজ্জাও করে না!"

কিন্তু ব্যঙ্গ বুঝিবার ক্ষমতা মান্নুর মার নাই। একেবারে আগুন

হইয়া সে বলিয়াছিল, "তুই মেয়ে হয়ে আমায় এত বড় কথা বল্লি? আমি সুখ ভোগ করেছি—"

তারপর তাহার রামের মত স্বামী ও লব বা কুশের কোন একটির মত শিশুপুত্রের মরণ সত্ত্বেও এবং আজ তাহার কাঙ্গালিনী অবস্থা জানিয়াও তাহার আপন কন্যা যে তাহাকে সুখ ভোগের খোঁটা দিল, এই শোকে সে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়াছিল।

এমনি করিয়াই হয়ত ঝগড়ার সমাপ্তি হইত কিন্তু দৈবাৎ মানদা কেমন করিয়া অসাবধানে মায়ের উনুন হইতে নামান ভাতের হাঁড়িটি ছুঁইয়া ফেলিল।

এমন ভুল হয় না! মানুর-মা মেয়ের ছোঁয়া খায় না, এবং এক বাড়ীতে থাকিয়াও ভিন্ন হেঁসেলে নিজের আহার নিজে সে রাঁধিয়া লয়। মানদা মায়ের এ আইন এতদিন সযত্নেই মানিয়া আসিয়াছে। আজ রাগের মাথায় অন্যমনস্কতায় এমন ভুলটা তাহার ঘটিয়া গেল।

কিন্তু মানুর-মা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, বেড়িটা সজোরে মাটির হাঁড়ির উপর মারিয়া সেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বলিল, "দিলি ত ছুঁয়ে, যাক্ চুলোয় যাক্ সব।"

মানদা প্রথম স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল কিন্তু মা যখন তাহার ক্রোধের আতিশয্যে ছড়ান ভাতগুলা মুঠা মুঠা করিয়া উনুনের মধ্যে ফেলিতে লাগিল তখন আর তাহার সহ্য হইল না, বলিল, "এত তেজ কিসের বল ত? আমার ছোঁয়া খেলে তোমার কী হয়? আমি হাড়ি না মুদ্দফরাস?"

মানুর-মা তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়াছে, বলিল,—"তুই যে কি তা দেশে দেশে জানে, কালামুখ তুই নাড়িস কি বলে। তোর ছোঁয়া খেয়ে আমি জাত-ধর্ম খোয়াব কোন্ দুঃখে?"

"আমার ছোঁয়া না খাও ত মর না। খাবার সাধই বা আর

কেন? সব খেয়েও আর হয়নি। এখন মরলে ত সকলের জ্বালা জুড়োয়।”

এই কথাটা সব চেয়ে নিদারুণ। মরিতে বৃদ্ধা চায় না, আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল, “আমি মরব কেনরে কালামুখী, তুই মর না, বাপ শ্বশুরকুলে কালী দিয়ে বেশ্যে হয়েছিলি—এখনও গলায় দড়ি দিসনি তুই কোন লজ্জায়!”

মানদা ইহার পর কানে আঙ্গুল দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। সে পুরাতন ইতিহাস সকল দিক দিয়া মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টাই মানদা করিয়াছিল, শুধু চাহিয়াছিল সে জীবনের উপর যে যবনিকা টানিয়া দিয়া আসিয়াছে তাহা যেন আর না ওঠে। মানুষের স্নেহ মানুষের শ্রদ্ধার মধ্যে দশ বৎসর সে সশঙ্ক হইয়া বাস করিয়াছে। কখন সে অতীতের গ্লানির স্পর্শে বর্তমানের শান্তি ও শ্রদ্ধার জীবন মরীচিকার মত মিলাইয়া যাইবে এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠার তাহার অবধি ছিল না। মাত্র কিছুদিন সে একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। এতদিনে তাহার আশা হইয়াছিল বুঝি অতীতের সে পঙ্ককুণ্ডে প্রায়শ্চিত্ত তাহার সম্পূর্ণ-ই হইয়াছে! সেই নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের উপর সেদিন এই বজ্রাঘাত।

অনেক দিনের কথা। কালো কুৎসিত অত্যন্ত কদাকার একটি মেয়ে। লোকে তাহাকে শুনাইয়াই বলিত, “হ্যালা, সোমত্থ বয়সে বলে শ্যাল কুকুরেরও ছিরি হয়”—

বাপের টাকার ঘুষে সুপাত্রেই বিবাহ হইল। কিন্তু ছেলের পছন্দ হয় নাই। মতের বিরুদ্ধে জোর করিয়া বিবাহ দেওয়ার প্রতিশোধ সে ওই কুৎসিত বালিকাটির উপরই শুধু লইল না, নিজের জীবনটাকেও ছারখার করিয়া দিল।

তারপর যেমনটি সংসারে নিত্য হইয়া থাকে তাহাই হইল। ছেলের নষ্ট হইয়া যাওয়ার সমস্ত অপরাধ সকলে নিঃসংশয়ে ওই কুৎসিত অলক্ষণা মেয়েটার ঘাড়েই চাপাইয়া দিল। উঠিতে বসিতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। স্বামী সৌভাগ্যক্রমে কোন দিন বাড়ী ফিরিলে সবাই মিলিয়া তাহার কুৎসিত দেহটাকে মাজিয়া ঘষিয়া বস্ত্রে অলঙ্কারে ঢাকিয়া স্বামী-ধরার ফাঁদ করিয়া তুলিতে চায়। অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে সকলের ঠেলাঠেলিতে সে সভয়ে ঘরের ভিতর গিয়া বিশ্বের লজ্জা লইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু তাহাকে দেখিবামাত্র স্বামী জ্বলিয়া উঠে।

"তোমরা কি আমায় বাড়ী থেকে না তাড়িয়ে ছাড়বে না? দূর তোর সংসারের মাথায় ঝাড়ু!" তাহাকে সজোরে বাঁ হাতে ঠেলিয়া দিয়া স্বামী বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়।

সে পড়িয়া গিয়া মেঝেতে নিঃশব্দেই বসিয়া থাকে। কান্নার চেয়ে গভীরতর বেদনায় চক্ষে তাহার জল আসে না।

শাশুড়ী আসিয়া ঝঙ্কার দিয়া বলেন, "ওগুলো খুলতে হবে না? সেজে-গুজে বসে থাকতে লজ্জা করে না?"

কিন্তু আবার তাহাকে সাজিতে হয়। এ অপমান বারবার তার সহ্য হয় না। কিন্তু উপায় কি? এতটুকু আপত্তি করিলে দশজনে দশ কথা শুনাইয়া দেয়। "কি হতচ্ছাড়া মেয়ে মা, স্বামী এসেছে তা একটু আহ্লাদও নেই!"

আবার কিন্তু তেমনি করিয়াই সব খুলিতে হয়।

সাজাইবার জন্য এই জেদাজেদি ধরপাকড় তাহার ভাল লাগে না। এই সবের হাত এড়াইবার জন্যে কোন দিন হয় ত সে স্বামী আসিলে নিজেই যাহোক করিয়া সাজিতে বসে। ননদ আসিয়া দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলে, "ওমা

তোমাদের সুন্দরী বৌ যে নিজেই সাজতে বসেছে গো! ওমা কি ঘেন্না! স্বামীর মন ভুলোবে গো, মন ভুলোবে! বিবি আমাদের মন-মোহিনী সাজছেন। স্বামী ত একটা লাথি দিয়েও আদর করে না।" কেহবা সহানুভূতির স্বরে বলে, "সাজলে কি হবে মা, কয়লার কালি কি ধুলে যায়?"

তবুও এও সহিত। এমনি করিয়া লাথি ঝাঁটা খাইয়াও স্বামীর সংসারেই জীবনের মেয়াদ সে আর পাঁচজন হতভাগিনীর মতই শেষ করিতে পারিত! বিদ্রোহ বাঙ্গালীর মেয়ে করিতে জানে না, সেও করিত না। কিন্তু বিধাতা তাহার প্রতি একান্তই বিমুখ।

সংসারে আর একটি লোক ছিল—শাশুড়ীর ভ্রাতুষ্পুত্র, নাম বিনোদ। অতি বড় পাষণ্ডেরা সংসারের চক্ষে সব চেয়ে ভাল করিয়া ধূলি দিতে পারে বলিয়াই তাহার নাম ইতিহাসে ওঠে নাই।

দেওর বলিয়া মানদা তাহাকে লজ্জা করিত না। ঘোমটা খুলিয়াই তাহার সামনে বাহির হইত। একদিন নির্জনে পাইয়া হঠাৎ বিনোদ তাহার গাল টিপিয়া দিল। মানদা সজোরে তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিল, কিন্তু বিনোদ পিছন হইতে হাসিয়া বলিল, "ইস্, বড় ঝাঁজ যে দেখি!"

মানদা আর তাহার সামনে বাহির হইত না।

বিনোদ একদিন আবদারের স্বরে তাহার শাশুড়ীর কাছে অনুযোগ করিল, "দেখত পিসিমা, বৌদি আমায় দেখে ঘোমটা দেয়, আমার সঙ্গে কথা কয় না। অন্যায় নয়?"

মানদা সেইখানে বসিয়াই ঘোমটা ঢাকা দিয়া তরকারী কুটিতেছিল। পাষণ্ডের এই নির্লজ্জ ধৃষ্টতায় তাহার সমস্ত অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সে মাথা তুলিল না।

শাশুড়ী ধমক দিয়া বলিলেন, "ও আবার কি ন্যাকামি! এদিক নেই ওদিক আছে। দেওর হয়, ওর কাছে আবার ন্যাকামি করে ঘোমটা দেওয়া কিসের?"

জোর করিয়া শাশুড়ী সেদিন ঘোমটা তাহাকে খুলাইয়া ছাড়িয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাতেও বিনোদের সুবিধা হইল না। মানদা সকলের সামনে তাহার কাছে ঘোমটা খুলিয়া রাখে, কথা কহিলে কোন রকম জবাব দেয় বটে; কিন্তু কেহ না থাকিলে তাহাকে একেবারেই এড়াইয়া চলে।

দেহ ছাড়া নারীর কোন মূল্য কোন প্রয়োজন যাহার কাছে নাই—সেই পাষণ্ড এই ব্যবহারে মরিয়া হইয়া উঠিল।

মানদা হঠাৎ মধ্য রাত্রে আতঙ্কে জাগিয়া উঠিল। একলা ঘরেই তাহাকে শুইতে হইত এবং শুইবার পূর্বে ভাল করিয়া দরজা বন্ধ করিয়াই সে শুইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ গায়ে মানুষের হাতের স্পর্শ পাইয়া সে সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিনোদ তখন আলো জ্বালিয়াছে। একটা হাত তাহার মুখে চাপা দিয়া অবিচলিতভাবে একেবারে সহজ কণ্ঠে সে বলিল, "চীৎকার করে লোক ডাকতে পার কিন্তু এ কেলেঙ্কারীতে এ বাড়ীর লোক তোমায় সতী বলবে না।"

তারপর বিছানার ধারে বসিয়া মুখের হাত তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি বলব, আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল। লোকে সে কথা বিশ্বাস না করলেও আমার ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার"—বলিয়া সে ঈষৎ হাসিল। মানদার সর্বাঙ্গ যেন আতঙ্কে অসাড় হইয়া আসিতেছিল।

অনেক কষ্টে সে শুধু বলিল, "তুমি এখান থেকে যাও।"—ক্ষীণ অস্ফুট ধ্বনি মাত্র।

বিনোদ আবার হাসিল, গলাটাকে কোমল করিয়া আদরের স্বরে বলিল, "সাবধান" এবং হঠাৎ মানদার হাতটা নিজের হাতে লইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "এমন নিষ্ঠুর স্বামীর ওপর প্রতিশোধ নিতেও ইচ্ছে করে না তোমার?"

মানদার মনে হইল তাহার নারীত্বকে এত বড় অপমান তাহার স্বামীও করে নাই। স্বামী তাহার কুরূপের ঘৃণা করে শুধু, আর এই পাষণ্ড তাহার সে-দেহকে ঘৃণারও অযোগ্য মনে করে। তাহার দেহ কুৎসিত বলিয়া ইহার কাছে পথের ধূলার চাইতেও সস্তা।

হঠাৎ কী যেন তাহার হইয়া গেল; এতদিনকার সঞ্চিত বেদনা, ক্ষোভ ও আক্রোশ তাহার সমস্তই এই লোকটার উপর অসীম ঘৃণা ও ক্রোধ হইয়া প্রকাশ পাইল।

সে প্রচণ্ড পদাঘাত বিনোদ সহিতে পারিল না। মানদার দেহ তখনও এমনি বিশাল ছিল এবং শক্তি ছিল যৌবনে বোধ হয় অনেক বেশী। বিছানা হইতে সজোরে ছিটকাইয়া সে একেবারে মেজেতে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া গেল। একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়া মুখ দিয়া তাহার প্রবলধারে রক্ত পড়িতেছিল। সেই ভাঙ্গা দাঁতটি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রক্তাক্ত মুখে বিনোদ তবু হাসিল—সে হাসি বিকট। তারপর মানদার কোলের উপর ভাঙ্গা দাঁতটি ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "যত্ন করে তুলে রেখ, অনেক দিন মনে থাকবে।"

বিনোদ বাহির হইয়া গেল ও মানদা বিমূঢ়ের মত বিছানার ধারে বসিয়া রহিল।

তাহার সর্বনাশের রাত্রেও সে অমনি ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ জাগিয়া

সবিস্ময়ে দেখিল তাহার ঘর লোকে লোকারণ্য। বাড়ীর ছেলে বুড়ো কেহ আসিতে বাকি নাই।

শাশুড়ী তাহাকে হিঁচড়াইয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন, "হারামজাদী ঘুমের ভান করে আছেন!"

তারপর যে কাণ্ড ঘটিল তার স্পষ্ট স্মৃতি মানদার মনেও এখন নাই। শুধু সেই অন্ধকার রাত্রে অসংখ্য লোকের সামনে দুঃসহ লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন দুঃস্বপ্নের মত তাহার মনে জাগিয়া আছে। ভাল করিয়া তখনও ঘুমের ঘোর তাহার কাটে নাই। সেই অবস্থায় মারিয়া ধরিয়া টানিয়া হিঁচড়াইয়া প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় এক বস্ত্রে সকলে তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

শাশুড়ী না কে বুঝি বলিতেছিল, "মাগো, দুধকলা দিয়ে কেউটে সাপ পুষেছি। আমার সোনার সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েও হল না গা, শেষ কালে এই—"

সকলের শেষে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বিনোদ বলিয়া গেল, "সে দাঁত অাঁচলে বেঁধে দিয়েছি।"

সে রাত্রে মানদা ভাবিয়াছিল মরিবে। কিন্তু মরিতে পারে নাই। তারপর পাঁচ বৎসর তাহার কেমন করিয়া কাটিয়াছে সে কথা বলিবার নয়। পিতা আগেই মারা গিয়াছিলেন। বিধবা মা কপর্দকহীন অবস্থায় ভায়ের সংসারে দাসীবৃত্তি করিতেছিল। পাঁচ বৎসর বাদে মাকে উদ্ধার করিয়া সামান্য যাহা কিছু জমাইয়াছিল, তাহাই সম্বল করিয়া মানদা একেবারে নূতন মানুষ হইয়া অতীতকে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িল। বিধাতা নারীর রূপ না দিয়া পুরুষের বুদ্ধি ও শক্তি দিয়াছিলেন। সেই বুদ্ধি ও শক্তি খাটাইয়া মানুষের সংসারে শান্তিতে বাস করিবার অধিকারটুকু সে অর্জন করিয়া লইল। সে পুরাতন ইতিহাসের সকল স্মৃতি ভুলিবার জন্য

অনেক দূরে এই পাড়ায় আসিয়া সে তাহার ঘর বাঁধিয়াছিল। যৌবনে তাহার কুৎসিত দেহকে মানুষ ঘৃণা করিয়াছে। যৌবন পার হইলে তাহার রূপের কথা ভুলিয়া মানুষ স্বেচ্ছায় তাহার হৃদয় ও বুদ্ধিকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দিল। জীবনে সবাই সব পায় না ভাবিয়া বঞ্চিত লাঞ্ছিত যৌবনের বেদনা বর্তমানের শান্তি ও শ্রদ্ধার মধ্যে ভুলিয়া থাকিতে পারাই সে যথেষ্ট মনে করিয়াছিল।

কিন্তু তাহা হইবার নয়! সে অভিশপ্ত অতীতের বিষ-নিশ্বাস দেশ ও কালের ব্যবধান পার হইয়া তাহার জীবনকে নিষ্ঠুরভাবে ঝল্‌সাইয়া দিয়া গেল।

মানদা বাড়ী হইতে বাহির হইতে চায় না। কিন্তু না হইলেও নয়। মেয়েমানুষ হইয়া পুরুষের কাজ করিতে গেলে ঘরে বসিয়া থাকা চলে না। ভাড়া আদায় করিতে যাইতে হয়; ঘরামি ডাকিয়া চালের মটকা বাঁধা তদারক করিতে হয়; জমিদারের খাজনা না দিয়া আসিলে নয়।

মানদা খাজনা লইয়া গেল। জমিদার-গিন্নী সংকুচিত ভাবে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল,—"বস দিদিমণি বস। ওরে একখানা পিঁড়ে নিয়ে আয়।" কিন্তু পিঁড়ে কেহ আনিল না। খালি মেঝের উপর বসিয়া নিজের কাজ সারিয়া মানদা ফিরিয়া আসিতেছিল হঠাৎ একটা দরকারী কথা মনে পড়ায় সে ফিরিয়া গেল। কিন্তু ঢুকিতে সে পারিল না। দরজার কাছে গিয়া যে কথা তাহার কাণে গেল, তাহাতে তাহার দু'টি পা সেইখানেই নিশ্চল হইয়া গেল।

জমিদার-গিন্নী তখন ঝঙ্কার দিয়া কর্তাকে বলিতেছিল, "লোক পাঠিয়ে খাজনা আদায় করে আনতে পার না? ও সব লোক বাড়ী আসে আমি পছন্দ করি না।"

কর্তা মৃদুস্বরে বোধ হয় কিছু আপত্তি করিলেন। গৃহিণী গলা আরও চড়াইয়া বলিল, "তাইত! বড় যে দরদ দেখি! ঢলানে মাগী যে মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে দেখছি। ওই ব্যবসা করেই ত খাচ্ছে—দেবে না!" মানদা সেদিন নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু শুধু এই নয়। বাঙ্গাল-বৌএর ছোট্ট মেয়েটা মানদার অত্যন্ত ন্যাওটো হইয়া পড়িয়াছিল। সময়ে অসময়ে আসিয়া উৎপাত করিত, অধিকাংশ দিন মানদার কাছেই সে রাত্রে শুইয়া থাকিত। মায়ের বারণ সত্ত্বেও অবোধ মেয়েটা আসিয়া সেদিন মানদার কাছে পয়সার জন্য আব্দার করিতেছিল। হঠাৎ ঝড়ের মত আসিয়া বাঙ্গাল-বৌ তাহাকে ছিনাইয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল এবং দেয়ালের ওপিঠে, আড়ালে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "তোমাদের দু'টি পায়ে গড় হয়ে বলছি বাপু, আমার মেয়েটির মাথা আর খেয়ো না—ওকে গেরস্তের বৌ হ'তে হবে, ঘর-সংসার করতে হবে।"

সেদিন রাত্রে মানদা, ঠুকিয়া ঠুকিয়া হাতের নোয়া ভাঙ্গিল ও কেন বলা যায় না জল দিয়া ধুইয়া গামছা দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া সিঁথির সিঁদুর-চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিল। তারপর যৌবনে সেই দুঃসহ লাঞ্ছনার রাত্রে নিদারুণ লজ্জাতেও সে যাহা করিতে পারে নাই প্রৌঢ়ত্বের পারে আসিয়া আজ সে তাহাই করিল।

সকালবেলা বৃদ্ধা মানুর-মা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া চিৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিল। লোকে আসিয়া ধরাধরি করিয়া মৃতদেহ নামাইল। পাড়াময় হট্টগোল পড়িয়া গেল।

কিন্তু মুশকিল হইল এই যে, কেহ মড়া শ্মশানে লইয়া যাইতে চাহে না। মড়া পড়িয়া রহিল। লোক জড় হইল, কিন্তু কেহ অগ্রসর হইল না। প্রথম অবস্থায় না ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহারা গলার দড়ি

খুলিয়া মৃতদেহ নামাইয়াছিল, তাহারা ধরা পড়িবার ভয়ে তখন একেবারে গা ঢাকা দিয়াছে।

কিন্তু মুখুজ্যে-মহাশয় ছুটিয়া আসিলেন। কয়েকদিন আগে ভাগিনেয়ের বিবাহে অন্যত্র গিয়াছিলেন, এসব কথার কিছুই জানিতেন না। সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া বলিলেন, "কে বলে মানদার মড়া ছোঁব না? কে সে? এই আমি ছুঁচ্ছি।"

কিন্তু লোকে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, বলিল, "শুনেছেন কি সব কথা?"

মুখুজ্যে-মহাশয় রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "শুনেছি, কিন্তু মানদাকে বেশ্যা বলেছে কোন্ মুখ্যু শুনি? ধরে নিয়ে এস তাকে আমার কাছে।"

একজন হাসিয়া জবাব দিল, "বলেছে ওরই মা!"

মুখুজ্যে-মহাশয় তবু দমিলেন না। বলিলেন "ওর মা আহাম্মক! আর তোমরা তার চেয়ে বেশী। রাগের মাথায় কে কি কথা বলেছে, সেইটেই হবে সত্যি? এই আমি এখানে ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছি, আহ্নিক না করে কখন জলগ্রহণ করি নি। বলুক দেখি ও আমার পা ছুঁয়ে ওই কথা।"

মান্নুর-মা নড়িল না, বিনাইয়া বিনাইয়া সে তখন তাহার স্বামী, দুইমাসের শিশুপুত্র ও মানদার মৃত্যুর মিলিত শোকে কাঁদিতেছে।

"দেখলে ত!" বলিয়া মুখুজ্যে-মহাশয় অগ্রসর হইয়া দুই হাতে মানদার দেহ ছুঁইয়া বলিলেন, "এখন দেখি কোন্ বেটা না ছোঁয়!"

মৃত্যুতেও মানদার সাধ মিটিল না। পুলিশকে ঘুষ দিয়া মাথাময় সিঁদুর লেপিয়া পায়ে আলতা পরাইয়া সমারোহ করিয়া পাড়ার লোক তাহার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেল।

তাহার মা কাঁদিল, মুখুজ্যে-মহাশয় চক্ষুর জল মুছিলেন এবং যাহারা লজ্জা দিয়া তাহাকে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহারাও সত্যকার দুঃখেই সতীলক্ষ্মীর জন্য চক্ষের জল ফেলিল।

দেবতার মহত্ত্ব মানুষের নাই, মানুষ পিশাচের মত নিষ্ঠুরও নয়, মানুষ শুধু নির্বোধ।

সত্য-মিথ্যা

দিনের বেলা সেখানে সত্যই আলো জ্বলে।

বড় রাস্তার পাশে ভাঙা পুরান একটি ভূতুড়ে গোছের বাড়ী। তারি অন্ধকার একটি গলিপথ দিয়ে দোকানে উঠতে হয়।

চায়ের দোকান, বিজ্ঞাপন নেই তবু চলে ভাল। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিক্রির কামাই নেই।

হঠাৎ ভাগ্যক্রমে দোকানটি আবিষ্কার করে ফেলেছিলাম এবং তার চেয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম অপূর্বকে আবিষ্কার করে।

মাঝারি গোছের পাতলা ছিপছিপে চেহারা, মুখে অত্যাচার উচ্ছৃঙ্খলতার শত চিহ্ন সত্ত্বেও কেমন যেন একটি মাধুর্য আছে—কিন্তু সে মুখ দেখে তার বয়স ঠিক করা কঠিন।

প্রথম দিন আমারি পাশে বসে ছেলেদের খেলার মার্বেলের মত একটি সুবৃহৎ আফিং-এর ডেলা মুখে ফেলে দিয়ে আমার দিকে একবার আড় চোখে চেয়ে সে বিনা পরিচয়েই বলেছিল, 'হজমি গুলি মশাই, ভয় পাবেন না।'

কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ হল একটু অদ্ভুত ভাবে। দু'টি পেয়ালা চা উপরি উপরি নিঃশেষ করে পয়সা বার করতে গিয়ে হঠাৎ সে যেন অত্যন্ত ভীত বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। এক এক করে পকেট-গুলো উল্টেপাল্টে তন্ন তন্ন করে খুঁজে অত্যন্ত করুণ হতাশ ভাবে বললে, 'আমার পয়সা কি হল?'

দোকানদার হাত পেতে সামনেই দাঁড়িয়েছিল—বললে, 'কোন্ পকেটে রেখেছিলেন? পড়ে গেছে বোধ হয়।'

'পড়ে গেছে কি হে, পকেট ফুটো নয়, কিছু নয়, পড়ে অমনি

গেলেই হ'ল!—দশটাকার একটা নোট—আর খুচরো আনা দশেক—সব পড়ে গেল!'

দোকানদার এবার চটে গিয়ে বললে, 'গেল না গেল আমার কি মশাই, দিন চায়ের দাম দিন!'

ভেংচে অপূর্ব বললে, 'চায়ের দাম দিন, দেব কোথা থেকে শুনি?'

'মিনি মাগনা চা খেয়ে চোখও রাঙ্গিয়ে যাবেন নাকি মশাই?'

অপূর্ব হঠাৎ আমার হাতটা ধরে ফেলে বলেছিল, 'আপনাকে বলতে আমার বাধছে মশাই, কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে দু-আনা পয়সার জন্যে কি অপমানটা হলাম চোখে ত দেখলেন। অনুগ্রহ করে যদি'...

তার দু'আনা পয়সা দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম, অপূর্ব সঙ্গে আসতে আসতে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিল 'চেনাশুনো নেই, তবু আজ যে ভাবে ভদ্রলোকের মান আপনি রাখলেন মশাই আপনাকে কি আর বলব—হ্যাঁ আপনার ঠিকানাটা বলুন ত।'

বললাম 'থাক আর দরকার নেই।'

'না না, আপনার ও দু-আনা দু'দশ টাকার সামিল, কিন্তু তবু যতটুকু ঋণ শোধ হয়।'

প্রথম দিনই মনে হয়েছিল লোকটা বকে বড় বেশী কিন্তু তবু কেমন যেন তাকে ভালও লেগেছিল।

বাড়ী ফিরে এসে সেদিন মণিব্যাগটা খুঁজে পাই নি।

পরের দিন সকাল বেলাই অপূর্ব এসে হাজির। গায়ে একটি ছেঁড়া পাঞ্জাবি, পায়ে ছেঁড়া জুতো। ঘরে ঢুকেই একগাল হেসে বললে, 'কাল সারারাত মশাই আপনার কথা ভেবেছি—ওই চোরের আড্ডায় দু-

আনা পয়সার জন্যে কি অপমানটাই যে হতুম সে কথা ভেবে বার বার আপনাকে কত যে ধন্যবাদ দিয়েছি তা আর বলতে পারি না।'

বললাম—'সামান্য দু-আনা পয়সার জন্যে আপনি আমায় বড় বেশী লজ্জিত করে তুলছেন অপূর্ববাবু।'

'না না সামান্য নয় মশাই, ওরা দু' আনা পয়সার জন্যে মানুষকে খুন করে ফেলতে পারে—আপনি জানেন না ওটি কি ভয়ানক গুণ্ডার আড্ডা।'

'আপনিই বা এত কথা জানেন কি করে?'

অপূর্ব ঈষৎ হেসে গলার স্বর নামিয়ে বললে, 'আমাদের ও সব যে জানতে হয়!'

'কেন?'

অপূর্ব গলার স্বর আরো নামিয়ে বললে—'পুলিশের চাকরি মশাই অনেক ল্যাঠা। এইত এখন প্রাণটি হাতে করে নিয়ে চললাম এক কোকেনখোরের আড্ডায়। ধরব কি ধরা পড়ব স্বয়ং বিধাতা পুরুষও জানেন না।'

'আপনি গোয়েন্দা না কি?'

'নামটা আর করবেন না মশাই, জানি বড় ছোট কাজ কিন্তু কি করব, পেটের দায়।'

পকেট থেকে হঠাৎ আমার মণিব্যাগটি বার করে টেবিলের ওপর রেখে অপূর্ব বললে, 'কিন্তু আমরা এই ছোট কাজ করি বলেই ধনপ্রাণ নিয়ে আপনারা সুখে স্বচ্ছন্দে কাটান এইটুকুই যা সান্ত্বনা।—দেখুন আপনার ত?'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'আপনি পেলেন কোথায়?'

'পাব আর কোথায়—চোরের ওপর অমন বাটপাড়ি আমাদের হামেশা করতে হয়। কখন হারিয়েছিলেন মনে আছে?'

বললাম, 'না।'

হেসে অপূর্ব বললে, 'দোকানদারের পকেট থেকে এটা আমায় উদ্ধার করতে হয়েছে। দোকানদারকে চায়ের দাম দেবার পর এটা আপনার পকেটে আর ঢোকেনি।'

অপূর্ব সেদিন কিছুতেই ছাড়লে না। দু-আনা পয়সা দিয়ে দু'শ বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, কোকেনের আড্ডায় ছদ্মবেশে চোর ধরতে যাওয়ার বিপদ সম্বন্ধে ভয়াবহ বক্তৃতা দিয়ে এবং পরিশেষে আমার সিগারেটের প্যাকেটটা ভুলে নিজের পকেটে রেখে দু'ঘণ্টা বাদে যখন সে বেরিয়ে গেল তখন ব্যাগ খুলে দেখলাম সেটি একেবারে খালি।

তারপর অপূর্বর যাতায়াত ঘন ঘন আমার মেসে শুরু হল। অত্যন্ত বক্তার হলেও মানুষের মনোহরণ করবার একটি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা তার ছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই মেসের সকলের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ সে হয়ে উঠ্‌ল যেন সবার সাথে কতদিনের তাব পরিচয়। তাব ম্যাজিক দেখাবার কৌশল, গোয়েন্দাগিরির অসাধারণ কাহিনী ইত্যাদি দিয়ে আমাদের মাঝে সে একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা কিছুদিনের মধ্যেই অর্জন করে নিলে।

দোষ-ত্রুটি অবশ্য তার যথেষ্ট ছিল। সন্ধ্যাবেলা হয়ত বাড়ী ফিরে দেখি আমার ঘর আমাব অসাক্ষাতে খুলে আমার ভাল ভাল পোশাক-গুলি বেছে পরে সে বেরিয়ে গেছে। পরেব দিন কিন্তু কিছু বলবার অবসর সে দিত না। নিজে থেকে সহস্রবার ক্ষমা চেয়ে আমায় অবশেষে লজ্জিতই কবে তুলত।

পাশের ঘরের বিনয়বাবু একদিন এসে বললেন, 'আচ্ছা অপূর্ব বাবুত গোয়েন্দাগিরি করেন, কিন্তু ওঁর অত টাকার অভাব কেন হয় বলতে পারেন?'

'কি করে জানলেন?'

'কেন মেসের সবার কাছেইত ওঁর দশ বিশ টাকা ধার। সেদিন দেখি না ঠাকুরের কাছ থেকেই পাঁচ টাকা ধার করে নিলেন। আমাদের কাছে ধার করুন তাতে কিছু বলি না, কিন্তু ঠাকুর চাকরের কাছে অমন করলে যে মান যাবে।'

সেদিন সত্যি ক্রুদ্ধ হয়ে ভাবলুম এবিষয়ে তাকে শাসন করে দিতেই হবে।

কিন্তু লোকটা যেন অন্তর্যামী। সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ ঘরে ঢুকেই কি যেন মনে পড়াতে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'দাঁড়াও ভাই, ঠাকুরকে পাঁচটা টাকা দিয়ে আসি, কাল যা বিপদে পড়ে ঠাকুরের কাছে টাকা চেয়েছিলাম বলতে পারি না।'

ফিরে এসে বিপদের যে কাহিনী সে বললে—তাতে বিশ্বাস না করে পারা যায় না।

ঘরে ঢুকেই ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললে, 'ঝকমারির কাজ ভাই এই গোয়েন্দাগিরি। এক এক সময়ে মনে হয় ছেড়ে দিই, কি নিষ্ঠুরতা যে করতে হয় এক এক সময়!'

কাহিনীটি তার করুণ। কিছুদিন থেকে কলকাতার এক ট্যাঁশ পাড়ায় লুকিয়ে কোকেন বিক্রি হচ্ছে সংবাদ পেয়েও পুলিশ কাকেও ধরতে পারছিল না। সেই খোঁজেই অপূর্ব সেদিন সেপাড়ায় গিয়ে নাকি আবিষ্কার করে একটি সাত আট বছরের ট্যাঁশ ফিরিঙ্গির মেয়েই এ ব্যাপারের মূল।

বলতে বলতে অপূর্বর চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল। '—ছোট্ট সাত বছরের মেয়ে ভাই, ছোট ছোট হু'টি ধবধবে খালি পা, ধুলোয় ময়লাতেও সে পা দেখলে পোটোর গড়া লক্ষ্মীর পা-হু'খানির কথা মনে পড়ে। গায়ের ছেঁড়া নোংরা জামা, আর ফ্যাকাশে রোগা মুখে হু'টি সরল বড় বড় ভীরু কাতর চোখ। সে মুখ দেখলে করুণা হয় না

এমন পাষণ্ড বোধ হয় নেই। মুখের দিকে চোখ তুলে চাইলেই মনে হয় এই মাত্র সে যেন কেঁদে চোখ মুছে উঠেছে। সে-ই কোকেন বিক্রি করছে দেখেও যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন যে এতদিন পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি এইবার বুঝতে পারলাম। মেয়েটি ভিক্ষে করে বেড়াতে বেড়াতে হাত পাতে, কেউ পয়সা দিলে বলে, 'চলবে ত ?' যারা এ ব্যাপারের ব্যাপারী নয় তারা 'চলবে' বলে চলে যায়। যারা সন্ধান জানে তারা তখন বলে, 'না চলবে না, বদলে দিচ্ছি।'—এইটুকু ইঙ্গিত। তারপর কোকেন ও তার দাম বিনিময় হয়।

উপায় নেই। ওই কথা বলার পর কোকেন বার করতেই ধরতে হ'ল। শীর্ণ রোগা দু'টি হাত মনে হয় টুসকি দিলে ভেঙে যাবে। ধরবামাত্র কাতর ভাবে সে একবার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বললে, 'আমায় ছেড়ে দাও।'

কঠিন হবার চেষ্টা করে বললাম, 'তুমি কোকেন বিক্রি করছ কেন ?'

এবার সে কেঁদে ফেললে। ফ্যাকাশে রক্তহীন গাল বেয়ে সে চোখের জল পড়ার দৃষ্টি সহ্য করা যায় না। তার জামার ভেতর থেকে কোকেনের মোড়কগুলি বার করে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। কাজ নেই আমার গোয়েন্দাগিরির বাহাদুরিতে। সবাই বিফল হয়েছে আমিও না হয় তাই বলব।

কিন্তু মেয়েটি তবু কাঁদতে লাগল।

অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেড়ে দিলাম তবু কাঁদছ কেন ?'

মেয়েটি প্রথমে কিছু বলতে চায় না! অনেকক্ষণ ধরে আদর করে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করবার পর বললে, 'বিক্রি করে টাকা না নিয়ে যেতে পারলে ওরা আমায় মেরে ফেলবে।'

এই 'ওদের' কথা আমার অজানা নয়। এমনি সব নিরীহ লোকদের দিয়ে ব্যবসা তারা চালায় আর কোন ত্রুটি হলে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই। একবার ইচ্ছা হ'ল ওর সাহায্যে তাদের ধরা যাক্। অন্য কেউ হলে তাই করতাম। কিন্তু তা করলে এই মেয়েটির জীবন যে কি ভয়ানক বিপন্ন হয়ে উঠবে তা ভেবে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত টাকার জিনিস ছিল।'

বললে, 'দশ টাকার।'

পাঁচটা টাকা মাত্র আমার কাছে ছিল। বাকী পাঁচ টাকা তখন কোথায় পাই? মেসে এসে তাড়াতাড়ির জন্য নীচে থেকে ঠাকুরের কাছেই তখন চেয়ে নিলাম।'

গল্প শেষ করে অপূর্ব বললে, 'একথা যদি পুলিসে জানতে পারে ত আমার শুধু চাকরি যাবে না, প্রাণ নিয়ে টানাটানি।'

অবিশ্বাস করিনি তবু একটা খট্‌কা সেদিন লেগেছিল। কখনো বাঙালী কখনো হিন্দুস্থানী কখনো ফিরিঙ্গি এমনি একটি সাত বছরের অনাথ অসহায় মেয়েকে অপূর্বর অনেক কাহিনীর ভেতরেই দেখেছি।

রাত্রে ঠাকুর ওপরে খাবার দিতে আসবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, 'অপূর্ব বাবু তোমার টাকা শোধ দিয়েছে ঠাকুর?'

ঠাকুর একটু সঙ্কুচিত হয়ে বললে, 'না বাবু।'

পরের দিন সকালে অপূর্ব এলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমার সব গল্প বানানো। কাল তুমি ঠাকুরকে টাকা ত দাওনি।'

সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ বিস্মিত হয়ে বল্‌লে, 'দিইছি তাওত কাল আমি বলিনি। ঠাকুরকে কাল যে নীচে গিয়ে পেলাম না, দেব কি করে? এইত এখন দিয়ে আসছি।'

কিন্তু গোয়েন্দাগিরি একদিন অপূর্বর ফাঁস হয়ে গেল। বিনয়বাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এসে মেসে খবর দিলেন, 'আমি বরাবর জানি সে

একটা জোচ্চোর বদমাশ মশাই, শুধু আপনাদের কথাতেই আমার পঁচিশ টাকা গচ্চা গেল!'

আরো কিছুক্ষণ গালাগাল করে বিনয়বাবু অবশেষে জানালেন যে খুন করবার চেষ্টা ও লুকিয়ে কোকেন বিক্রির অপরাধে পুলিশ অপূর্বকে ধরে নিয়ে গেছে। গোয়েন্দা সে কোন পুরুষে নাকি নয়। লুকিয়ে কোকেন বিক্রিই তার ব্যবসা। কোন জঘন্য পাড়ায় এক গণিকার বাড়ী থেকে সে ব্যবসা চালাত। সে বেশ্যার সঙ্গে কি রকম ঝগড়া হওয়ায় বেশ্যা পুলিশকে সব কথা বলে দেবে বলে ভয় দেখায়। এই রাগে অপূর্ব নাকি তাকে পানের সঙ্গে বিষ দিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা করে। বেশ্যা মরে নি কিন্তু হাসপাতালে সব কথা প্রকাশ করে দেওয়ায় পুলিশ অপূর্বকে গ্রেপ্তার করেছে।

আইনের ফাঁকিতে খুনের অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেও লুকিয়ে কোকেন বিক্রি ইত্যাদির অপরাধে অপূর্বর তিন বৎসর জেল হল।

তিন বৎসরে অপূর্বর কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ একদিন নীচে থেকে নেয়ে এসে ঘরে ঢুকে দেখি সে দিব্যি আরামে আমার খাটের উপর শুয়ে আছে।

আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, 'তুমি যা বলবে তা জানি, কিন্তু সত্যি বলছি একেবারে এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

বিরক্ত হয়ত একটু প্রথমে হয়েছিলাম কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। আমার মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে আমার মনোভাব বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করে সে বললে, 'সত্যি তোমায় বিরক্ত করবার ইচ্ছা আমার নেই। বল, চলে যাব?'

বললাম, 'না থাক্, তুমি খেয়ে এসেছ?'

সে একটু ম্লান হেসে বললে, 'কাল ত জেল থেকে বেরিয়েছি।'

খাওয়া দাওয়ার পর দুপুর বেলা সে বললে, ‘এই দুপুরটুক্ কাটিয়েই ভাই যাব, কিছু মনে করোনা।’

‘কোথায় যাবে ?’

‘দেশে’—বলতে বলতে তার চোখ অশ্রু-সজল হয়ে এল, ‘তিন বছর তাদের কোন খোঁজ পাইনি ভাই, আছে কি না তাও জানি না।’

খানিক সে চুপ করে অন্য দিকে চেয়ে রইল। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, ‘তোমার কাছে আগাগোড়া মিথ্যে বলে এসেছি। প্রথম দিন মিথ্যে অভিনয় করে তোমার কাছে চায়ের পয়সা আদায় করেছি, তোমার ব্যাগ চুরি করে গোয়েন্দাগিরির গল্প করেছি, সুতরাং আজ যদি আমার কথায় তুমি অবিশ্বাস কর তাহলে তোমায় দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু সত্যি ভাই এই শেষ বারটা আমায় বিশ্বাস কর—আমি মিথ্যা বলছি না।’

বললাম, ‘তোমায় অবিশ্বাস করব এমন কথা ত বলিনি।’

‘না বলনি, কিন্তু আমি ত জানি আমায় বিশ্বাস করা তোমার পক্ষে কত কঠিন.........’

আরো অনেক সে কথা বলতে যাচ্ছিল। বললাম, ‘আসল কথা কি বলই না ?’

আসল কথা পঞ্চাশটি টাকা সে চায়। দেশে তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে। তিন বৎসর সে তাদের খোঁজ পায় নি। তাদের, বিশেষ করে তার ছোট মেয়েটিকে দেখবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

দেশে যাবার ভাড়া আর সামান্য কিছু না হলে সে যেতে পারে না। সেই টাকা ক’টি যদি আমি দিই।

বললাম, ‘তা দিচ্ছি, কিন্তু দেশে গিয়ে খাবে কি ?’

‘যা জমিজমা আছে তাতে কোন রকমে চলে যাবে।’ হেসে বললাম, ‘আর ও ব্যবসা করবে না ?’

সে উত্তরে একটু ম্লান হাসল মাত্র।

সমস্ত দুপুর শুয়ে শুয়ে সে তার সেই ছোট মেয়ে ডলুর কথাই থেকে থেকে বলতে লাগল। সাতবছরের মেয়ে কিন্তু তার দৌরাত্ম্যে বাড়ীর লোক শুধু নয়, পাড়ার লোক পর্যন্ত অস্থির।

'শুনলে বিশ্বাস হবে না ভাই, মেয়েটার কোন ভয় নেই। ডলুর মা হয়তো ভয় দেখিয়ে বলে, 'ভূতে ধরে নেবে ডলু।' ডলু বলে, 'কোথায় ভূত? দেখব।'

—হেসে বললাম, 'বাপেদের ছেলে মেয়েগুলো শুনেছি ওই রকমই হয় অপূর্ব।'

অপূর্ব উঠে বসে তীব্র প্রতিবাদ করে বললে, 'কখ্খন না, আরো ত ঢের ছেলেমেয়ে আছে। ওইত আমার বড় ছেলেই রয়েছে, সবাই কি ও রকম?'

এখানে কথা বলা উচিত নয় বুঝে চুপ করে রইলাম। অপূর্ব বলে যেতে লাগল, 'ধমকে কোনও কথা তাকে বলবার যো নেই। তাহলে ডলু একেবারে কুরুক্ষেত্র করে তুলবে। কিন্তু মিষ্টি করে বুঝিয়ে বললে ডলুর আর কোন আপত্তি নেই।'

খানিক চুপ করে থেকে আবার অপূর্ব বললে, 'সেবারে অসুখ করেছিল ডলুর; তাকে নিয়ে যে মুশকিলে পড়েছিলাম বলতে পারি না। আর কেউ তার কাছে থাকলে চলবে না, তার বাবা থাকা চাই। কারো কথায় বার্লি খাবে না কিন্তু আমি যদি বলি, 'বার্লিটুকু খেয়ে নাও ত ডলু নইলে তাড়াতাড়ি ভাত খেতে পারবে না, আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারবে না।' ডলু তৎক্ষণাৎ রাজী।'

একটু থেমে অপূর্ব বললে, 'ঘুমোচ্চ নাকি?'

বললাম, 'না, তোমার ডলুর কথা ভাবছি।'

'তাকে ছেড়ে ঠিক আসতাম না ভাই, সময় পেলেই যেতাম কিন্তু

কি যে পয়সার নেশা ধরেছিল! ভেবেছিলাম এমনি করে কিছুদিন জুয়াচুরি করে যদি চিরদিন সুখে থাকবার মত পয়সা রোজগার করে নিতে পারি মন্দ কি? কারো ত আর সত্যকারের অনিষ্ট করছি না। যাক্ সে কথা।'

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে অপূর্ব পারে না। খানিকবাদেই বললে, 'যাবামাত্রই ছুটে এসে বলবে, বাবা লকেট এনেছ? লকেট ফল?' একবার লকেট ফল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম; সেই থেকে লকেট ফলের দিকে তার ভারি ঝোঁক। এখন আবার লকেট ফলের সময় নয়, দেখি কোথাও পাই কিনা।'

এবার হেসে বললাম, 'তোমার মেয়ে কিন্তু আর সাত বছরের নেই অপূর্ব; এই তিন বছরে সে অন্ততঃ দশ বছরের হয়েছে, আর লকেট ফলের কথা মনে নাও থাকতে পারে।'

কিন্তু একথায় অপূর্বের মুখ যেন অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে উঠ্‌ল। আমার দিকে একবার বিমূঢ়ের মত চেয়ে সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে এ সাময়িক বিষাদ যেন ঝেড়ে ঝুড়ে ফেলে বললে, 'আর আমার ওপর তার টান যদি দেখতে ভাই! আমার জিনিস সে কাউকে ছুঁতে দেবে না—তার মাকে পর্যন্ত না। 'ছুঁয়োনা ও যে বাবার।' কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, 'আমি যে অপূর্বর মা হই।'

এমনিতর সারা দুপুর অপূর্ব বকে গেল। বিকাল বেলা টাকা নিয়ে চলে যাবার সময় আমার হাত ধরে সত্যই কেঁদে ফেলে সে বললে, 'আমার যে উপকারটা তুমি করলে ভাই। কি আর তোমায় বলব।'

অপূর্ব বেরিয়ে যেতেই বিনয়বাবু ঘরে ঢুকে বললেন, 'কে এসেছিল? সেই চোট্টা খুনে অপূর্বটা না?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'টাকার জন্যে এসেছিল ত। উঃ, ওর বেহায়া সাহসকে বলিহারি যাই—কিন্তু একটু বাধল না। কি বলে চাইলে ?'

'ওর বৌ ছেলে মেয়েকে অনেকদিন দেখেনি, দেশে যেতে হবে এই বলে ?'

'আপনি দিলেন নাকি টাকা ?'

'দিলাম ত !' বলে একটু হাসলাম।

বিনয়বাবু পরম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'আপনি ওর কথায় বিশ্বাস করে ওকে টাকা দিলেন ! ও বললে, 'বৌ ছেলে মেয়েকে দেখতে যাব' আর আপনি অমনি ভাল মানুষটির মত সমস্ত বিশ্বাস করলেন ! আশ্চর্য আপনার বিশ্বাস। আরে ওর কি বৌ ছেলে মেয়ে আছে ! আমি যে ওর সব খোঁজ নিয়েছি।'

'কি নিয়েছেন ?'

'কি আবার নিইনি, সব নিয়েছি ! ওর কোন চুলোয় কেউ নেই। একটা বিয়ে করেছিল বটে কিন্তু সে বৌ ত দশ বছর আগে ওরই জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। একটা বছর ছয় সাতের মেয়ে ছিল, তাকে ত ও সঙ্গে নিয়ে সেই বছরই কোন্ মেলায় গিয়ে হারিয়ে আসে। বলে হারিয়ে আসে কিন্তু আমার বিশ্বাস ওসব মিছে কথা। ও কাকে মেয়েটা বেচে দিয়েছে। ওসব লোক সব পারে। কিন্তু আপনি না জেনে শুনে এটা কি করলেন বলুন ত ! এমন ডাহা আপনাকে ঠেকিয়ে গেল !'

বললাম, 'আপনি যা বললেন আমি সবই জানি।'

'জানেন ! বলেন কি, জেনে শুনে আপনি জোচ্চরটাকে টাকা দিলেন ! না মশাই আপনি হয়ত বিশ্বাস করছেন না। ওর বৌ ছেলে মেয়ে নেই। আমি সত্যি সব খোঁজ নিয়েছি !'

'আমি আপনার চেয়ে আরেকটুকু বেশী খোঁজ নিয়েছি বিনয়বাবু। দশ বছর ধরে ওর স্ত্রী কন্যা নেই জানি, কিন্তু এই দশ বছর ধরে সমস্ত অন্যায় অপরাধ জুয়াচুরির ভেতর ও সেই সাত বছরের মেয়েকে খোঁজবার জন্যে সমস্ত জায়গা তোলপাড় করে বেড়িয়েছে, যেখানে কোন ছোট অসহায় মেয়ে দেখেছে সেখানে উন্মত্ত হয়ে তাকে আদর করেছে। অসম্ভব প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলেছে, এমন কি ওর সেই সাত বছরের মেয়ে বেঁচে থাকলে আজ যে সতেরো বছরের হয়েছে সে খেয়াল পর্যন্ত ওর নেই, এই পাগলামিটুকুর কথা বোধ হয় আপনি জানেন না। ওর সমস্ত কথা হয়তো মিথ্যে কিন্তু ওর মনের সে সাতবছরের মেয়ের জন্যে ব্যাকুলতা মিথ্যে নয়।'

বিনয়বাবু আমার দীর্ঘ বক্তৃতায় বোধ হয় বিরক্ত হয়েই বেরিয়ে গেলেন।

অপূর্বর সঙ্গে আর জীবনে দেখা হয়নি। তার সেই হারানো শাশ্বত সাতবছরের মেয়েকে সে পেয়েছে কি না কে জানে।

পোণাঘাট পেরিয়ে

রোগা লম্বা শালতিগুলি আসে, খড়, ধান, চালের বোঝাই নিয়ে নড়ালে পোলের তলা দিয়ে—দক্ষিণ থেকে। নোণা দেশের মিশ্ কালো চাষী বাঁশের লম্বা লগি বায়; দরমার ছাউনির তলায় উনুনে ভাত ফোটে।

উত্তর থেকে আসে হাঁড়ি, টালি, বালি, ইট, গুড়ের বোঝাই নিয়ে মহাজনী নৌকা।

নদী মরে এসেছে। এককালে গাধাবোটেও আপত্তি ছিল না, আজকাল জোয়ারের সময় বড়জোর বিশমাল্লা পর্যন্ত চলে। ভাঁটায় শুধু শালতি।

এখানে নদীটির অত্যন্ত দৈন্যদশা। শীতকালে ভাঁটার সময় হাঁটু পর্যন্ত জল ওঠে কিনা সন্দেহ।

হালদার কোম্পানির চালান-সরকার বিদেশী লোক, নতুন কাজে বাহাল হয়েছে, সেদিন সে কাকে বলেছিল, "খালের জল যা ঘোলা, নাইতি পারবা না।"

"খাল! খাল! তোমার নানা কাটিয়েছিল"—বুড়ো সরকাব মশায় দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন—"এই খালের এক ফোঁটা জল পেলে তোমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়! খাল! ডোবা!"

"আমার খুশী, আমি এক'শ বার খাল বলব আপনার কি!"

"আমার কচু! তুমি নর্দমা বল না, মা গঙ্গার মুখে থুতু দাও না!"

—এমন তাদের রোজই হয় ছোট-খাট জিনিস নিয়ে। তার

কারণও আছে। বুড়ো সরকারের বকাটে ঘর-জামাইটা গোলায় গোলায় পাশা চেলে গাঁজা-ভাঙ টেনে দিন কাটায়।

সরকার মশাই বলেন, "তার ত একটা হিল্লে হয়ে গেছল, ওই-বেটা না উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লে।"

কথাটা ষোলআনা সত্য নয়। জামাইকে বলে কয়ে তিনি কাজে লাগিয়ে একরকম দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন মুখার্জি-কোম্পানির সরকার এসে হট্টগোল বাধিয়ে দিলে। "সকাল থেকে মাল নেই; তিনশ' মিস্ত্রি বেকার বসে আছে, দু'ফেরা সুরকি মুটের মাথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন! বলিহারি আপনাদের আক্কেল! কে এখন গুণগার দেবে শুনি?

সত্যিই গুরুতর ব্যাপার!

"গাড়োয়ানরা ত অনেকক্ষণ মাল নিয়ে বেরিয়ে গেছে, এতক্ষণ ফিরে আসবার কথা!" খোদ কর্তা গদি থেকে বিপুল দেহভার তুলে উদ্বেগে হাঁস-ফাঁস করতে লাগলেন।

মুখার্জি-কোম্পানি বড় খদ্দের!

শেতল মোড়ল হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, "আজ্ঞে, আমি ত শুধু দু'ফেরা সুরকি চেয়েছিলাম!"

"তারপর?"

"পঁচিশ গাড়ী সুরকি নিয়ে আমি কি আমার গোরে চাপা দেব?"

বুড়ো সরকারের বকাটে জামাই তখন নির্বিকার মুখে চালান লিখে চলেছে।

খোদ কর্তা হাঁকলেন, "কে, চালান সই করেছে কে?"

"আজ্ঞে আমি!"—

ব্যাপার বিশেষ কিছুই নয়—একই রাস্তার নম্বরগুলো একটু ওলট্‌পালট্ হয়ে গেছে। অমন ভুল ত হ'তেই পারে।

বুড়ো সরকার-মশাইএর চোখ ফেটে জল বেরোয় আর কি !

তাঁর জামাই কিন্তু অত্যন্ত বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, "কাল থেকে তাহ'লে আর আসতে হবে না ?"

"না।"

আর পরশু ?"

"না, না।"

"আজ্ঞে কোনদিন যদি দরকার বোধ করেন ডাক দিলেই আমি আসব, জানেন ত ওই গুলিখোরের ঘাট।"

দু'জোড়া রোষরক্ত চোখের সামনে দিয়ে আর কেউ অমন অবিচলিত ভাবে বেরিয়ে আসতে পারত না বোধ হয় ! কিন্তু বলাই-এর কাঠামই আলাদা।

আর চাকরির বালাই নেই। নির্ভাবনায় বলাই ঘুরে বেড়ায়। সরকারমশাই বলেছেন, "মুখ দেখতে চাই না।" মুখ দেখবার চেষ্টা করলেও তিনি সফল হতেন বলে মনে হয় না—সে সুযোগ মেলা ভার।

শাশুড়ী ঝনাৎ করে ভাতের থালাটা নামিয়ে দিয়ে মুখ হাঁড়ি করে ঘরে গিয়ে ঢোকেন। বলাই নির্বিকার মুখে থালাটি নিঃশেষ করে উঠে যেতে যেতে বলে, "ডালটা যা হয়েছে, অমৃত !"

বুড়ো সরকারের ষোড়শী কন্যা ভ্রূকুটি করে মনে মনে বলে, "মরণ আর কি !"

শাশুড়ী গলা ছেড়েই বলে, "চোদ্দ পো অধর্ম না করলে এমন জামাই হয় ! ওঁর ভীমরতি ধরেছিল, নইলে রাজ্যে আর পাত্তর ছিল না।"

বলাই একটু মুচকে হাসে ; তাচ্ছিল্যভরে দেওয়া পানটা বৌএর হাত থেকে নিয়ে বলে, "একটু চুন ! তারপর একটু থেমে বলে, "সঙ্গে না হয় একটু কালিও দিও !"

চপলা ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

এবছর বাজার বড় মন্দা, নদীতে দাঁড়ের ঘা পড়ে না। দক্ষিণ থেকে দু'টি একটি শালতি কখন-বা আসে, লগি বেয়ে,—উত্তরের কুদ্‌ঘাটায় কেরানী নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়—

"হ্যাঁ বাবা পেটো, বেশ করে বেড়োন্ দাও নইলে অত আয়েশ সইবে কেন? ফুলে মরে যাবে যে! গতরে ঘূণ ধরে যাবে! কাজ যেমন নেই, রোজ সময় করে একটু একটু বেড়ন দিচ্ছ ত?"

মেহরারু বলদটাকে রেহাই দিয়ে বললে—"নেহি বোলাই বাবু, এ বলদটো ভারি বদমাশ আছে, ইহার লিয়ে হামার বিলকুল লোকসান হয়ে গেলো। আর সব বলদ হামার নাল বাঁধাতে লাগে দু-আনা, আর ই-শালার খালি গিরাই লাগে একটাকা! তারপর নয়া রশ্‌শি —উভি দশ আনার কমতি নেই!"

অনেকগুলো গরুর গাড়ী ল্যাজ তুলে অতিকায় ফড়িঙের মত পড়ে ছিল। তারি একটায় বেশ আয়েশ করে বসে বলাই বললে— "তেমনি একটি বছরের মত যে খালাস বাবা! দুষ্টু গরুর সুখ ত ওই! ক্ষুর কখন পাতলা হবে না, ও আট দিন অন্তর নাল বাঁধাবার হাঙ্গামা নেই!"

ওসমান কাছেই বসে জীয়ুতের ভঁইষের নাল বাঁধছিল। লোহার নালে একটা গজাল ঠুকে বললে, "ঠিক বলেছেন বাবু! আমি এই বিশ বছর নাল বাঁধছি, একটা দুশমন গরুর পাতলা ক্ষুর দেখলাম না।"

"কিন্তু এত নাল বাঁধা-বাঁধিই বা কিসের রে বাপু! বসে বসে গাড়ি হাঁকাতে ত বোধ হয় ভুলেই গেলি! বলদগুলো কি আজকাল দাঁড়িয়ে নাল খোয়াচ্ছে, না সুরকি পটির নসীব ফিরল?"

জীয়ুৎ ছুটি বিড়ি বার করে, একটা বলাইএর দিকে এগিয়ে ধরল—"কাঁহা নসীব বাবু, কৌনো গোলামেঁ বিক্রি-উক্রি কুছু নাহি বা, আজ্ ছ রোজ হামার একগো খেপ মিলল না।"

নাল বাঁধা শেষ হয়ে গেছল। ওসমান মোষের পা থেকে দড়িটা খুলে নিতে নিতে বললে—"সত্যি এবছর বাজার এত ঢিলে কেন বলুন ত বলাইবাবু—"

মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বলাই বললে, "শহরে কি আর টাকা আছে রে বাপু, যে লোকে বাড়ী করবে!"

খানিক থেমে সকলের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলাই আবার বললে, "একটাকার নোট বেরিয়েছে দেখেছিস্?

'হাঁ, দেখেছে!"—মেহ্রারু আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলাই তাকে বাধা দিলে, "খালি কাগজ! ওই কাগজ দিয়ে ভুলিয়ে সব টাকা বিলেতে চালান করে দিচ্ছে তা জানিস্?

এ খবরটা তারা কেউ জানত না বটে স্বীকার করলে।

"টাকা এদেশে থাকলে ত লোকে বাড়ী করবে! সব টাকাই যে বিলেতে!"

তিন জনেই মাথা নেড়ে জানালে—ঠিক কথা বটে—বলাইবাবু ধরেছেন ঠিক,—"আচ্ছা, বিলেতে টাকা পাঠাচ্ছে কেন?"

"কেন? আবার যে যুদ্ধ বাধবে রে!

"ফির্ লড়াই!"

বলাই গরুর গাড়িটায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে বললে, "তবে আর বলছি কি? সুরকি-পটিতে লোক চলতে পারত না, দু'মাস অন্তর রোলার ইঞ্জিন আসত রাস্তা মেরামত করতে! আর এখন?"

"আমি আর খাদেম এ রাস্তার নাল বেঁধে কুলিয়ে উঠতে পারতাম না বাবু"—ওসমান কথাটাকে শেষ করতে পারল না।

মেহ্রারু নদীর দিকে মুখ করে বসেছিল, উল্লসিত হয়ে হাঁকলে, "উ নাও আছে না কি আছে বোলাই বাবু ? দেখেন ফিরে !

বিস্ময়ের কথাইত ! পোণাঘাটের বাঁকের মাথায় ইটের ভরা দেখা দিয়াছে।

একটি নয় দু'টি নয়, পাঁচ পাঁচটি ইটের ভরা পোণাঘাটের বাঁকের মাথায় পর পর দেখা দিল। বলাই হাঁকলে, "কোন্ ঘাটে বাঁধবে মাঝির পো ?"

হালীর মাচা থেকে উত্তর এল, "হালদারদের গো হালদারদের !"

তা হালদারদের ছাড়া আর কাদেরই বা হওয়া সম্ভব !

রাস্তায় যেতে যেতে একটি লোক থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বললে ? হালদারদের না ?"

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে একটু হাসল মাত্র। উত্তর দিলে না। লোকটা বিরক্ত হয়ে বলাইএর দিকে বিষদৃষ্টি হেনে চলে গেলে।—একটু যেন খুঁড়িয়ে !

"খোঁড়া-বাবুর চোখ টাটাচ্ছে !" ওসমান হাসতে লাগল।

খোঁড়া-বাবুর সঙ্গে হালদার কোম্পানির সতাসতীন সম্পর্ক। কার সঙ্গেই বা নয় ?

সুরকিপটিতে সাড়া পড়ে গেছে।

গরুর গাড়ির উপর বলাই চিত হয়ে শুয়েছিল। একে একে দু'জন সরে পড়েছে। প্রথমে গেল জীয়ুৎ—তার দামাদ আসবে, তাকে সওদা করতে যেতে হবে।

জীয়ুৎ যেতে না যেতে মুখ বেঁকিয়ে মেহ্রারু জানালে—জামাই এসেছে না আরো কিছু—ও শুধু খেপ্ মাংতে যাওয়া তা আর কে না বুঝতে পারে ; অত ছোট মেহ্রারু হতে পারে না। আপন

খুশীতে খেপ কেউ দেয়, বহুত আচ্ছা! নইলে খেপ পাবার জন্যে উমেদারি করতে হবে? আবার ভরা ঘাটে না লাগতে লাগতে,—ছোঃ—!

মেহরারুকেও কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে হয়। নড়ালের পোল পেরিয়ে একবার নূতন চাক্কাটার কি হ'ল খোঁজ করতে যেতে হবে।

আজ সবারই দরকার নড়ালের পোলের দিকে!

খানিক চুপ করে থেকে চোখ বুজেই বলাই বললে, "ওসমান আছিস্!"

"হাঁ বাবু!"

"চুপি চুপি দু'পুঁটলি নিয়ে আয় দেখি।"

ওসমান আপত্তি করে বললে, "না না বাবু, আজ বড় বেলা হয়ে গেছে, ঘরে যান, সরকারমশাই আবার রাগ করবেন।"

মুদিত চোখেই হাত নেড়ে বলাই বললে, "বাজে কথা ফেলে তুই যা দেখি, দু'টি পুঁটলি আর আধসের রাবড়ি বুঝেছিস্? আমি ওই গুলিখোরের ঘাটে আছি।"

খানিক ওসমানকে নীরব দেখে বলাই বললে, "ঘাটে পাঁচ-পাঁচটা ভরা লেগেছে আবার ভাবনা? যা যা খপ্ করে আয়!"

"আজ্ঞে না বাবু. ভৌজি আপনার জন্যে বসে থাকবে—।"

বলাই একটু হেসে বললে, 'রাবড়িটা একটু লুকিয়ে আনিস্।'

অগত্যা ওসমান গেল।

বেলা বেশ বেড়ে গেছে। জীয়ুতের মোষটা নিজে নিজেই গিয়ে নদীতে নামল। কিন্তু বলাইএর ভ্রূক্ষেপ নেই। গরুর-গাড়িটার ওপর তেমনি ভাবেই এই প্রচণ্ড রোদে এলো গায়ে সে পড়ে রইল।

কিন্তু বেশীক্ষণ পড়ে থাকা গেল না।

পায়ে সুড়্‌সুড়ি লাগতেই চমকে ঘুম ভেঙে গেল।—"ফের

এসেছিস্ ছুট্‌কি। আজ তোর বাবাকে বলে দেবই!—দেখ্ তাহ'লে!"

কিন্তু ছুট্‌কি সে কথা শুনতে পায় কেমন করে! সে ত তখন তার নতুন রঙীন ডোরদার শাড়ী বাঁচিয়ে গোবর কুড়োতে অত্যন্ত ব্যস্ত!

খোঁড়া-বাবু আবার ফির্‌ছিল। দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে কি একটা উদ্যত কথাকে সে দমন করলে তাও বোঝা গেল। বলাই কিন্তু তার ভ্রূকুটিকুটিল অগ্নিদৃষ্টির প্রত্যুত্তরে হেসে বললে, "বড়ি পিয়াস লাগল্ এ ছুট্‌কি, তনি মেহেরবানি করি কি ন।"—

খোঁড়া-বাবু এতখানিই বা সহ্য কেমন করে' করে!

ছুট্‌কি আবার ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে—মুখে কাপড় দিয়ে দুষ্ট হাসিটুকু লুকোবার ভান করে।

রাত অনেক হয়ে গেছে।

বলাই পা টিপে টিপে ঘরে গিয়ে ঢোকে। চপলা বই পড়ায় ব্যস্ত, ফিরেও তাকায় না। বলাই চুপ করে দাঁড়িয়ে খানিক আড়চোখে দেখে, তারপর খপ্ করে পাশে বসে পড়ে, বইটা হাত থেকে কেড়ে নেয়। ঝটকা দিয়ে বইটা আবার ছিনিয়ে নিয়ে চপলা রুক্ষস্বরে বলে, "ও আবার কি ন্যাকাপনা! সরে বোস্। ওসব গাঁজা-গুলির গন্ধ আমার সয় না!"

বলাই ভুরু দু'টো তুলে একটু মুচকে হাসে। বলে,—"মাইরি আজ মুখ শুঁকে দেখ, খাসা কচি আমের গন্ধ না পাও ত আমায় দূর করে দিও। তোমার জন্যেই শেষটা গাঁজা ছেড়ে চরস ধর্‌তে হ'ল।"

চপলা উত্তর দেয় না। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর আপনমনেই বলে, "মুখ নাড়তে লজ্জা করে না?

মানের ত একে সীমা নেই—গাড়োয়ান ইয়ার, ঠিকাদার ইয়ার, গরুর নাল বাঁধে যে মোছলমান, সেও ইয়ার। তাও না হয় হল। শেষটা বামুনের ছেলে হয়ে কৈবর্তর ঘাড়ধাক্কা খাওয়া। কোন্ মুখে সে আবার লোকসমাজে বেরোয়—দাঁত বের করে কথা ক'য়! দু'কান-কাটা বেহায়া! দড়ি কলসি জোটে না!"

কথাটা মিথ্যে নয়।

ক'দিন ধরেই খোঁড়া-বাবু প্রতিশোধ নেবার তক্কে ছিল। সুযোগও মিলতে দেরি হল না। কবে থেকে খোঁড়া-বাবু গুলিখোরের ঘাট আবার জমা নিয়েছে তা কে জানে। দুপুরে বলাই রোজকার মতই শিষ্যসাকরেদ সমেত মৌতাতের আড্ডাটি জমিয়েছে, এমন সময় দরওয়ান সমেত খোঁড়া-বাবু এসে হাজির। তারপর বেপরোয়া ঘাড় ধাক্কা। মৌতাত তখন বেশ জমে উঠেছে। শান্ত সুবোধ ছেলের মত সবাই বেরিয়ে এল।

ওসমান ছিল না। এসে শুনে বললে, "এইবার হাতে হাঁট্তে হবে, ঠেঙোব বায়না দিতে বলে আসি খোঁড়া-বাবুকে।"

বলাই হেসে বললে, "তা'হলে এতদিন ধরে ছাই নেশা করেছিস্। রক্ত যদি গরমই হ'ল তবে আব মানুষের বার হলি কোথায় ?"

ব্যাপারটা ওইখানেই থেমে আছে।

চপলা কথাগুলো বলে পাশ ফিবে শোয়। তারপর খানিক সব চুপচাপ। পূবের জানালা দিয়ে যে সামান্য গ্যাসের আলোটুকু আসে তাতে কেউ কাউকে দেখতে পায় না।

পেলে বোধ হয় ভাল হ'ত।

বলাই বিছানার ধাবে এসে বলে, "মাইরি, রাত্রে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, এখন দডিও পাব না কলসিও না। রাতটুকুর মত একটু সরে শুতে দাও।"

চপলা বিছানা থেকে নেমে মেজেতে আঁচল পেতে শোয়। বলাই বিনা বাক্যব্যয়ে বিছানায় এসে শোয়, খানিক এপাশ-ওপাশ করে, তারপর বলে, "উ, বেজায় গরম, ঘাটে যেতে হ'ল।"

বলাই বেরিয়ে যায়। চপলা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। তার কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

ক'দিন ধরে খোঁড়া-বাবুর খিলে-ডিঙিটা পাওয়া যাচ্ছে না। তাজ্জব ব্যাপার!

কেউ বলে—"কুদ্‌ঘাটার গজের মধ্যে আট্‌কে আছে দেখে এলাম।

সরকার-মশাইএর জামাইএর নাকি ক'দিন ধরে পাত্তা নেই—।



ঘটির কাণায় লেগে শাঁখা-গাছটা গেল ভেঙে।

মা বললে, "যাবে না? অত খর-খর হলে যাবে না। ভাঙল ত এই বেস্পতিবারটায়?"

চপলা আর-একটা শাঁখা সজোরে আছড়ে ভেঙে বললে, "ভাঙুক—; ভাঙুক, সব ভাঙুক! সব যাক।"

মা গালে হাত দিয়ে চোখ কপালে তুলে বললে, "ওমা, কি হবে গো! কি অলুক্ষণে পোড়া-কপালি মেয়ে গো! এইস্ত্রী-মানুষ শাঁখা হু'টো ঠুকে ঠুকে ভাঙলে গা এই বেস্পতিবারে!"

চপলা হুম্ হুম্ করে ঘরে গিয়ে ঢুকে খিল দিয়ে বললে, ভেঙেছেই ত কপাল ত পুড়েইছে! আমার হাড়ও জুড়িয়েছে, তোমরাও নিশ্চিন্তি হয়েছ। একমাস ধরে একটা মানুষের কি আর অমনি খবর মেলে না! আছে কোন্ আঘাটায় আট্‌কে এতক্ষণ

দেখগে যাও! আর দেখবারই বা কার দায় পড়েছে! তোমাদের কাছে শ্যাল্ কুকুর বইত নয়!"

খবর মিল্ল।

কোমরে দড়ি দিয়ে পাহারাওয়ালা ধরে নিয়ে এল। খিলে-ডিঙি সমেত বলাই নড়ালের পোলের তলাতেই এসে হাজির! বলিহারি সাহস!—

বুড়ো সরকার-মশাই গিয়ে বললেন, "আমি বামুন হয়ে তোমার হাতে পৈতে জড়িয়ে মিনতি করছি বাবা, এবার মাপ করো।"

থোঁড়া-বাবু অত নরম মাটি নয়! অত সহজে সেখানে দাগ বসে না। বললে, "বিস্তর সয়েছি মশাই! আপনার জামাই, আর ভদ্রলোকের ছেলে বলে বিস্তর সয়েছি! এ সুরকি পটির কলঙ্ক!"

"তাত স্বীকার যাচ্ছি বাবা, তবে তোমরা যদি মাফ্ না কর তাহ'লে করবে কে? তোমরা হ'লে এ পটির মাথা।"

থোঁড়া-বাবু বলাইর দিকে ভ্রূকুটি করে চেয়ে বললে, "কিন্তু মাথাও মাঝে-মাঝে গরম হয়। বাছাধন পীরের সঙ্গে মাম্দোবাজি করতে গেছলেন যে!"

বলাই তখন পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করছে,—"সাহেব, তামাদের মুলুকে লুকিয়ে-চুরিয়ে নেশাটা আশটা চল্‌বে ত? নইলে বাবা বেহ্মহত্যার পাতক হবে!"

কথাটা জোরেই বলা হয়েছিল। সবাই শুনতে পেল।

থোঁড়া-বাবু সরকার মশাইর হাতটায় একটা টান দিয়ে বললে, শুনলেন ত'—গাঁজলা এখনও মরেনি। না মশাই, আমি কিছু করব না।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে খোঁড়া-বাবু পারল। খোঁড়া-বাবুর দয়ালু ব'লে দুর্নাম পটিতে নেই। কিছু বোঝা গেল না।

বলাই বলে, "তোমার বাবাই ত সব মাটি করলে, ছেলেবেলায় পড়াশুনায় ভালো ছিলাম, সবাই বলত জলপানি পাব, তা অতদূর আর দেখবার ফুরসুত হয়নি; এবার ভাবলাম এতদিনে বুঝি ভবিষ্যদ্‌-বাণীটা ফলে গেল, সরকারের টাকাটা সৎপাত্রে পড়ল, তা তোমার বাবা হতে দিলে কি?"—রসিকতাটা ভাল জমে না। বলাই নিজেই হো হো করে হাসে। হাসিটাও যেন কেমন মনমরা। বলাইএর হোল কি?

চপলা কথা কয় না। বলাই আবার বলে,—"বিদেশে একটা চাকরি পাচ্ছি, যেতে বল ত যাই—"

"যমের বাড়ী একটা চাকরি মেলে না?"—চপলা তেমনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

"মিলতে পারে, দরখাস্ত করে দেখিনি।"

বলাই বেরিয়ে যায়।



—ওসমান বলে, "সে কি আর এখানে আছে বাবু যে তাকে দেখতে পাবেন! ছুট্‌কিকে এখন পায় কে?"

বলাই জিজ্ঞাসা করে,—"তার মানে?"

খোঁড়া-বাবু তাকে মাসোহারা দেয় ত্রিশ টাকা—তার বাপকে দেয় দশ। তা ছাড়া নগদ কত দিয়েছে কে জানে!"

"আকলু রাজী হ'ল?"

ওসমান হাতের টাকাটা দু'বার বাজিয়ে বলে,—"দুনিয়া গোলাম—"

বলাই খানিকক্ষণ কি ভাবে—তারপর বলে, "হাঁ, খোঁড়া-বাবু নতুন খড়ের গোলা খুল্‌ল ?"

"খুল্‌বে না ? পটির সবাইকে কাণা করে দিলে রাবিশে আর ঘুষে। মুখার্জি-কোম্পানির মাল এখন কোথা থেকে যাচ্ছে ? চারটে লরীর ঠেলায় রাস্তা থর-থর করছে রাতদিন !

বলাই বলে, "বহুৎ আচ্ছা, চল্‌।"

চোখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে ওসমান বলে, "কোথায় বাবু ?"

"খোঁড়া-বাবুকে সেলাম দিতে।"

ওসমান ধরে রাখতে পারছিল না, কাতর হয়ে বললে, "বাবু, বড্ড বেসামাল হয়ে পড়েছেন, রাতও অনেক হ'ল, ইদিকে নয়—বাড়ী চলুন।"

বলাই তার হাতটা ধরে টানতে টানতে বলে, "চুপ, নড়ালের পোল আর কতদূর বলনা—"

"ওই ত দেখা যাচ্ছে বাবু, রাত দু'টো হ'ল।"

"তবে তুই যা !"—বলাই তার হাতটা ছেড়ে দিলে, কিন্তু নিজে টাল না সামলাতে পেরে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ল। ওসমান নিজেও বেশ টল্‌ছিল, তবু কোনরকমে ধরে তুলে আবার মিনতি করে বললে, 'কোথায় চলেছেন বাবু ?"

"এইটে খোঁড়া-বাবুর নতুন গোলা, না ?—বলাই থম্‌কে দাঁড়াল।

সমস্ত পটি নিস্তব্ধ। নড়ালের পোলের আলোগুলো নদীর স্থির জলে পড়ে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করছিল।

"ফটকের তালা ভাঙতে পারবি ?"

ওসমান বলাইএর চোখের দিকে চাইল ; অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। বললে,—"বাবু বাড়ী চলুন।"

"পারবি কি না বল ?"

অনেকক্ষণ পরে উত্তর এল,—"পারব।"

তালা ভাঙা হ'ল। পকেটের বোতলটা বার করে নিঃশেষ করে তেলটা ঢেলে বলাই বললে, "দে দেশলাইটা—"

লোকে লোকারণ্য ! তিনটে দমকলে আগুন সামলাতে পারছিল না। আকাশ যেন তেতে রাঙা হ'য়ে উঠেছে। পোণাঘাট ছাড়িয়ে কেঠোপটি পর্যন্ত বাতাসে পোড়া খড়ের গন্ধ আর উড়ো ছাই !

ওসমানের কাঁধে ভর দিয়ে যেতে বলাই বললে,—"দেখ্‌লি সেলাম ? নেশাখোর মানুষ—আমাদের রাগ করতে নেই, তবে আমাদের সেলাম এমনি !"

কারা বলতে বলতে যাচ্ছিল, "আহা, গরীব বেচারা গো, সর্বস্ব দিয়ে গোলাটি করেছিল।"

"গরীব বললে হবে কি বাপু ! বেহ্মশাপ ! মহাপাতক না হলে অগ্নিদেব দেখা দেন না।"

"তোমার মাথা ! পাশেই খোঁড়ার গোলাটা তা'হলে রয়েছে কি করতে ! যত মহাপাতক করেছিল ঐ নিরীহ গরীব বেচারী !"

বলাইএর কানে কোন কথাই যায় না।